ধূলার ধরণী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য—৩৲ টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজদাদা মহাশয়কে

আমার

"ধূলার ধরণী"

ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

দিলাম।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১২৪সি, বিবেকানন্দ রোড,

কলিকাতা।

ধূলার ধরণী

১

বাহিরে যে বিরাট জগৎ রহিয়াছে এতকাল জয়ন্ত তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় নাই। মা তাহাকে অতি সাবধানে নিজের বক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, বাহিরের তাপ এতটুকু তাহার গায়ে লাগিতে দেন নাই। জয়ন্ত এতকাল নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা লইয়া কাল কাটাইতেছিল,—মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা জগৎ হইতে সে কঠোর বাস্তব জগতে আসিয়া পড়িল। মায়ের শেষ দিনের কথা তাহার মনে হইতেছিল—"জগতে কেউ কারও নয় জয়ন্ত, কেউ বসিয়ে খেতে পরতে বা শাস্ত্রচর্চ্চা করতে বাজে খরচ করবে না। বই খাতা তুলে রেখে এখন তোমাকে নিজের জন্যে ঘুরতে হবে।"

মা সত্য কথাই বলিয়াছেন—। মাথার উপর দিয়া চব্বিশটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, জয়ন্ত এতদিন কোন দিকে চায় নাই। আজ এই প্রথম তাহার ভাবিবার দিন আসিল—এখন সে কি করিবে।

কাজের চেষ্টায় দু-একদিন সে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু সে বাহির হওয়া মাত্র। বি, এ, পাসের সার্টিফিকেটখানা সযত্নে সে রাখিয়াছিল, চাকরীর উমেদারীতে কাজে লাগিবে।

মা ও ছেলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত অতি অল্পের মধ্য দিয়া, বাহুল্যতা কিছুর মধ্যেই ছিল না। মাসিক সাত টাকা বেতনে এই ঘরখানি আজ

তিন বৎসর ভাড়া লইয়া তাঁহারা বাস করিতেছিলেন, এই একখানা ঘরেই মা ছেলের স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইত। বারাণ্ডার এক কোণে একটা উনান পাতিয়া মা তাহাতে রন্ধন করিতেন, ঘরের কোণে খাওয়া দাওয়া চলিত। ওদিককার ঘরটায় বাস করিতেন সুরেনবাবু, তিনি নয় বৎসর এখানে বাস করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বারাণ্ডার ওধারে রন্ধনাদি করিতেন।

মা যেদিন মারা যান সেদিন ও বাড়ী ও এ ধারের অংশটার মাঝখানে যে দরজা ছিল সেটা কে খুলিয়া দিয়াছিল তাহা জয়ন্ত লক্ষ্য করে নাই। সেদিন সে যখন হবিষ্যের প্রথম অনুষ্ঠান পর্ব্ব কি করিয়া করিবে ভাবিয়া আকুল হইতেছিল সেই সময় সেই দরজাটী খুলিয়া এ ধারে আসিয়া দাঁড়াইল একটী মেয়ে—তাহাকে জয়ন্ত ইহার পূর্ব্বে কোনদিন না দেখিলেও তাহার পরিচয় জানিত।

মেয়েটী দরজা খুলিয়াই সামনে জয়ন্তকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিল। সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "বেলা দেড়টা বেজে গেছে, হবিষ্যের যোগাড় এখনও হয়নি; আমার ঝি এদিকটায় যোগাড় করে দেবে কি ?"

জয়ন্ত মুখ তুলে নাই, আপন মনে হাতের বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, "না, যা করবার আমি করে নেব এখন, এ সব আর কেউ করলে হয় না।"

মেয়েটী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "না, আর কিছুই করা হবে না, আপনি ব্রাহ্মণ সে জ্ঞান আমাদের আছে। আমরা এ ধারটা পরিষ্কার করে ইঁট সাজিয়ে দিয়ে যাব, আর যা কিছু করবার তা তো আপনাকেই করতে হবে।"

জয়ন্ত মুখ তুলিতেই মেয়েটীর মুখের উপর চোখ পড়িল, হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল, চোখ আর ফিরাইতে পারিল না।

কোন মেয়ের মুখের পানে সে চোখ তুলিয়া চায় নাই, সামনে কদাচিত কোন মেয়ে আসিয়া পড়িলে সে পাশ কাটাইয়া গেছে, চোখ তুলিয়া দেখে নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা তাহার না থাকিলেও ভয় যে যথেষ্ট ছিল এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। একদিন ক্লাসের একটী মেয়েকে ছেলেদের বর্ব্বরোচিত তামাসা হইতে অথচ সে বাঁচাইয়াছিল। তাহার শক্তিশালী চেহারার পানে চাহিয়া সেই সব ছেলেরা হইয়া উঠিয়াছিল সন্ত্রস্ত এবং সেই মেয়েটী হইয়াছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বালিগঞ্জে তাহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য সে জয়ন্তকে অনেকবারই বলিয়াছিল, কিন্তু জয়ন্ত সেই একটী দিন ছাড়া আর তাহার সংস্পর্শে আসে নাই, আর কোনদিন তাহার সামনেও আসে নাই।

আজ এই প্রথম সে একটী মেয়ের মুখের পানে ভালোভাবে চাহিল।

গায়ের উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণটা চোখে পড়িল, মুখ সুন্দর কি না তাহা জয়ন্তের বিবেচনার অতীত, সে কেবল দেখিল তাহার বড় বড় দুইটী চোখ, সেই চোখে তাহার হারানো মায়ের স্নেহমাখা দৃষ্টি, তাই জয়ন্ত চোখ ফিরাইতে পারিল না।

মেয়েটী তাহার দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, যে কাপড়টুকু কেবলমাত্র মাথার অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়াছিল সেই কাপড় সে টানিয়া কপাল পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল, তাহার পর দাসীকে লইয়া নিজেই বারাণ্ডার একটা কোণ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

জয়ন্ত অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, "থাক থাক, ও সব তুমি পারবে না, তোমার ঝি বরং করুক,—এ সব কাজে তোমাদের হাত দেওয়া—"

মেয়েটী ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাতের কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া উদ্গত-প্রায় অশ্রু গোপন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, "ভয় নেই, আমি আপনার এখানে কোন অনাচার করব না আমি স্নান সেরে এসেছি। আর আপনার এখানে অন্য কিছুই করব না, কেবল এইগুলো গুছিয়ে দিয়ে যাব। আপনি তো শুধু কিছু আতপচাল আর সৈন্ধব নুন এনে ফেলে রেখেছেন দেখছি, কিসে করে রান্না হবে তার তো কোন যোগাড়ই করেন নি।"

দাসীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "সরকারকে বল গিয়ে বিন্দু কয়েকটা মালসা এখনি যেন কিনে এনে ঠাকুর মশাইয়ের এখানে দিয়ে যান, একটুও দেরী যেন না হয়।"

দাসী চলিয়া গেল।

বিব্রত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "এখনই না হয় নাই বা হল; খাব তো একবার মাত্র, এরপর সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে আস্তুম—"

উর্ম্মি উত্তর দিল—"উনি এখন খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন, বিকেলে উঠবেন তবে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, সে আর আজকের কথা নয়। তার চেয়ে এখনই কেন কাজ হয়ে যাক না—।"

সে তৎপরতার সঙ্গে সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। ইহারই মধ্যে মালসা ও কাঠ আসিয়া পৌঁছাইল, সেগুলা সাজাইয়া রাখিয়া উর্ম্মি বলিল, "এবার আপনি আপনার হবিষ্যি চড়িয়ে দিন ঠাকুর মশাই, আমি চললুম।"

উঠানের মাঝখানকার ছোট দরজা দিয়া সে ওদিকে চলিয়া গেল, দরজাও বন্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত উঠিল না, বইখানা কোলে করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

এই মেয়েটীর সম্বন্ধে সে যতটুকু জানে তাহাতে তাহার সহিত পরিচয় না থাকাই সে ভালো বলিয়া মনে করে। এই প্রকাণ্ড বড় বাড়ীখানায় উর্ম্মি আজ কয়েক বৎসর বাস করিতেছে। এধারে যে তিনখানি ঘর পৃথকভাবে ছিল তাহারই মাঝখানে একটা দেয়াল তুলিয়া দিয়া পৃথকভাবে ভাড়া দেওয়া হয়। এদিককার সঙ্গে ওদিককার কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে।

হয়তো কোনদিন ভাড়া দেওয়া ছাড়া সম্পর্ক ছিল না সে ভাড়াও ও বাড়ীর বাজার সরকার আসিয়া লইয়া যাইত। তিন বৎসরের মধ্যে জয়ন্ত কোনদিন মাঝের দরজাটা খুলিতে দেখে নাই। এই মেয়েটীর সহিত তাহার দাসীর যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা শুনিয়া জয়ন্ত বেশ বুঝিল তাহার অনুপস্থিতিতে প্রথমে ছাদের উপর হইতে মা ও উর্ম্মির সহিত আলাপ হয়, তাহার পর হইতে সকলের অনুপস্থিতিতে উর্ম্মি মাঝে মাঝে মায়ের নিকটে আসা যাওয়া করিত। মা মারা গেলে হয়তো সেও ফেলিয়াছে চোখের জল এবং সেই সম্বন্ধ ধরিয়াই এ বাড়ীতে তাহার পদার্পণ হইয়াছে।

পাশের ঘরের সুরেনবাবু তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, কি রকম ভায়া, ফিল্ম অ্যাক্‌ট্রেসের রকম সকম বুঝছো কেমন? অতটা ঘনিষ্ঠতা হওয়া দেখলে যেন কেমন লাগে যে।

জয়ন্ত উত্তর না দিয়া হবিষ্য চড়াইয়া দিল।

আহারের পর্ব্ব মিটাইতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

মাঝখানকার দরজাটা খট করিয়া খুলিয়া গেল, খোলা দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল উর্ম্মি, ওধারের উজ্জল বিদ্যুতালোক এধারের স্বল্প আলোযুক্ত বারাণ্ডায় ছড়াইয়া পড়িল।

উর্ম্মি জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া হয়েছে ঠাকুর মশাই ?"

জয়ন্ত উত্তর দিল না, বারাণ্ডার ধারে যেমন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

উর্ম্মি দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল, ডাকিল, "ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত মুখ তুলিল—

"হ্যাঁ, খাওয়া হয়েছে, কিন্তু—কিন্তু"

হঠাৎ সে দুই হাত যোড় করিল, "তোমায় মিনতি করছি, তুমি আর এসো না ; আমার খবর নেওবার জন্যে তোমায় এতটুকু ব্যস্ত হতে হবে না—তুমি যাও।"

উর্ম্মি যেন অত্যন্ত বেশী রকম আঘাত পাইয়াই বিবর্ণ হইয়া গেল ; দুই পা পিছাইয়া গিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না, ব্যস্ততা দেখাতে আমি আসিনি ঠাকুর মশাই। আপনার মা সত্যিই আমাকে দয়া করে হয়তো একটু ভালবেসেছিলেন তাঁর ছেলে আপনি, সেই জন্যেই আপনার খোঁজ নিতে এসেছি। এই তো চাল এনেছিলেন, বড় জোর দুটো কাঁচকলা এনেছিলেন,—কিন্তু আসল জিনিস মালসা বা কাঠ তা তো আনেন নি। আমি জানতুম—আপনি এই রকম প্রকৃতির লোক যাতে—"

বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "আসল কথা আমার সংস্থান নেই, আমার দিন চলার উপায় নেই। কিন্তু আমি চাইনে কেউ আমার বিষয় নিয়ে ভাবে বা তার প্রতিবিধান করতে এগিয়ে যায়। আমি আগে জানলে মাকে নিয়ে এখান হতে চলে যেতুম কারণ তোমার সঙ্গে আমার মায়ের আলাপ থাকা যে প্রশংসার বিষয় নয় তা তুমি সহজ জ্ঞানে বুঝতে পারছো।"

উর্ম্মির শুভ্র সুন্দর মুখখানা অপমানে লাল হইয়া গেল জয়ন্ত তাহা

দেখিতে পাইল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল।

একটু পরেই ওদিকে উর্ম্মির কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"ও দরজাটায় তালা লাগিয়ে দাও মাসিমা, ওদিকে ভাড়াটেরা রয়েছে, বিশ্বাস তো নেই। তালাটা দেওয়া থাক—নিশ্চিন্ত।"

জয়ন্ত হইল ততোধিক নিশ্চিন্ত। দরজার এধারে যদি কড়া কি শিকল থাকিত সে নিজেও এদিক হইতে একটা তালা লাগাইয়া দিত।

২

উর্ম্মির সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়।

উর্ম্মির প্রকৃত পরিচয় কেহ জানে না। এই বাড়ীটি অনাদি মিত্র নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ছোটবেলা হইতে উর্ম্মি এক অনাথ-আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে,—সেখানকার কথা তাহার আজও স্বপ্নের মত মনে হয়। জ্ঞান হইতে অনাদি মিত্র তাহাকে একটী স্কুলে দিয়া যান, সেখানকার বোর্ডিংয়েই সে থাকিত।

তিনিই ছিলেন উর্ম্মির গার্জ্জেন। রুক্ষ আকৃতি এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী উর্ম্মির কেহ হন কি না তাহা সে জানে না, অথচ তিনিই এ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত খরচ বহন করিয়া আসিয়াছেন।

উর্ম্মি ছুটির সময়েও বোর্ডিংয়ে থাকিত, তাহার যাইবার স্থান কোথাও ছিল না। পিতৃ নামে অনাদি মিত্রকে কোনদিন না ডাকিলেও বোর্ডিংয়ে

তিনি যে উর্ম্মির পিতা নামে নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সে সেখানেই শুনিয়াছিল, বহুদূরে—আফগানীস্থানে রাজ সরকারের কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন,—সেখান হইতে আসা যাওয়া ছিল কষ্টকর। উর্ম্মি তাহার জীবনে তিন চারবার ছাড়া তাঁহাকে আর দেখে নাই, পত্রও পাইত খুবই কম। মোট কথা অনাদি মিত্র তাহার নিকটে ছিলেন একটা জটিল প্রহেলিকা, তাঁহাকে সে চিনিতে বা বুঝিতে পারে নাই।

প্রতি মাসের দুই তারিখে অনাদি মিত্রের নিকট হইতে উর্ম্মির খরচ আসিয়া পৌঁছাইত, দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

উর্ম্মি যখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে, ম্যাট্রিক দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন সূত্রে জানিতে পারেন উর্ম্মি অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিতা এবং অনাদি মিত্র তাহার পিতা নহেন। অনতি-বিলম্বে তিনি অনাদি মিত্রকে খবর দিয়া আনান এবং ভালো কথায় বুঝাইয়া উর্ম্মিকে বিদায় দেন।

সে আজ আট বৎসরের কথা—।

আট বৎসর পূর্ব্বে অনাদি মিত্র এই বাড়ী ঠিক করিয়া উর্ম্মিকে এখানে রাখিয়া যান, তাঁহার নিজের জনৈক আত্মীয়াকে অভিভাবিকা হিসাবে রাখিয়া আট বৎসর পূর্ব্বে সেই যে গিয়াছেন, আজও আসেন নাই। নিয়মিতভাবে মাসের দুই তারিখে আজও তাঁহার নিকট হইতে টাকা আসে—কাজেই সংসার চলার কোন কষ্ট নাই।

সেবারে উর্ম্মি তাঁহার কাছে নিজের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল।

বোর্ডিং হইতে এ ভাবে বিতাড়িত হওয়াতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল বড় কম নয়। অনাদি মিত্র কঠিন ভাবে জবাব

দিয়াছিলেন—"তুমি কে সে পরিচয় তোমার পক্ষে না জানাই ভালো। কেবল এইটুকু জেনে রাখো—মাথা তুলে দাঁড়ানোর মত মুখ তোমার নেই, সকলের পাশে চলার অধিকার তোমার নাই, তোমায় থাকতে হবে সকলের পেছনে—মাথা নীচু করে। তোমার পরিচয় নেই—তোমার গোত্র নেই—আত্মীয়-স্বজন নেই, সমাজও নেই।"

তাহার পর বক্রমুখে কতকটা স্বগত ভাবেই বলিয়াছিলেন—"আঁস্তা-কুড়ের পাত কোনোদিন স্বর্গে যায় না, তার জায়গা চিরদিন আঁস্তাকুড়েই থাকবে।"

এই কথাটী উর্ম্মির মনে চিরকালের জন্য গাঁথা আছে।

পরীক্ষাটা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিজের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছিল, সে পরীক্ষা দেয় নাই,—কয়েক মাস নির্জ্জনে থাকিয়া তাহার পর সে স্বেচ্ছায় ফিল্মে যোগ দিয়াছিল।

লোকে তাহাকে অভিনেত্রী বলিয়া জানিল, ভদ্রসমাজে তাহার স্থান চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল উর্ম্মি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটা কিছু উপলক্ষ্য না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। উর্ম্মিও একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া বাঁচিতে চাহিল।

বাড়ীর এই অংশটা মোক্ষদা ভাড়া দিয়াছিল, উর্ম্মির সহিত বাড়ীর কোন কিছুরই সম্পর্ক ছিল না।

তিন বৎসর পরে উর্ম্মি অনাদি মিত্রের একখানি পত্র পাইয়াছিল,তিনি তাহার অভিনেত্রী জীবনের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, জানাইয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন উর্ম্মি হয়তো এ পথে যাইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছেন তিনি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করিয়াছিলেন। পিতার প্রভাব পুত্রের উপর এবং মায়ের প্রভাব যে কন্যার মধ্যে বর্ত্তিয়া থাকে তাহাতে

আজ তিনি সন্দেহ করিতে পারেন না,--ইহা অতি সত্য কথা। তিনি ঊর্ম্মিকে মানুষ করিয়া গড়িবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন, তাহার জীবনে যে কোন একটা সৎকাজের প্রেরণা জাগাইবার বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছেন সবই মিথ্যা হইয়া গেছে, তিনি কেবল ভস্মে ঘি ঢালিয়া গিয়াছেন। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, অদৃষ্টকে কেহ এড়াইতে পারে না বলিয়া ঊর্ম্মিকে যে ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে তিনি দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঊর্ম্মি ঠিক সেই ঘূর্ণাবর্ত্তেই গিয়া পড়িয়াছে।

হয়তো কোনদিন তিনি আসিয়া পড়িবেন এবং ঊর্ম্মিকে সোজা বিদায় দিবেন, ঊর্ম্মি সেজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সারা দুনিয়ার উপর তাহার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ চাপিয়া গিয়াছে। এই বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহার নিকট দুনিয়া নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছে, ইহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিভিয়া গিয়াছে। অথচ কয়েকটা বৎসর পূর্ব্বে এই দুনিয়াই ছিল তাহার নিকট বড় মনোরম, বড় আকর্ষণের বস্তু, আজ তাহাই তাহার নিকট রূপহীন কদর্য্য বলিয়া মনে হয়।

যে মানুষ তাহাকে এমনভাবে দূরে তাড়াইয়া দিল তাহার উপর সে প্রতিশোধ লইতে চায়। ভগবানের উপর নির্ম্মম আক্রোশ চাপে, কেন ভগবান তাহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি দিয়া পাঠাইলেন, কেন তাহাকে আশা ভরসা সুখের মোহ দিয়াছেন—কেন তাহাকে আর পাঁচজনের মত জীবন যাপন করবার অধিকার দিলেন না? জগতে সকলেই ভাই বোনের ভালোবাসা পায়, পিতামাতার স্নেহ পায়, কেন তাহার জীবন এমন বিড়ম্বিত হইল, কেন সে কিছুই পাইল না?

লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস সোমের শক্তকথাগুলা মনে পড়ে। তাঁহার মুখের উপর কয়েকটা রেখা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাঁহার

স্বভাব রুদ্ধকণ্ঠ যা যা সম্ভব নম্র করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি করব বাছা, বড় দায়ে পড়েই তোমায় বিদায় দিতে হল। এখানে যে সব মেয়েরা থাকে তারা সবাই ভদ্রঘরের মেয়ে, এর মধ্যে তোমায় তো রাখতে পারিনে বাছা, না আছে বাপের নাম, না আছে মায়ের পরিচয় এতে আমি কোন সাহসে তোমায় এখানে রাখি বল।"

উর্মি অনুনয় করে নাই,—সে দৃঢ়পদে চলিয়া আসিয়াছিল।

পাড়ার লোক সকলেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল তাহা সে জানে। কদাচিৎ বৈকালে ছাদে বেড়াইবার সময় পাশাপাশি ছাদে অনেক মেয়েকে দেখা যাইত; তাহারা পরম কৌতূহলে বিস্ফারিত নেত্রে এই তারকার পানে চাহিয়া থাকিত, অথচ কেহ কোনদিন তাহার সহিত আলাপ করে নাই। উর্মি জানে এই সব পবিত্র পুরাঙ্গণাগণ তাহাকে কতখানি ঘৃণা অবহেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে করুণামিশ্রিত চোখে দেখেন। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে সে হাসে।

এই সময় জয়ন্তের মায়ের সঙ্গে হঠাৎ তাহার আলাপ হইয়া গিয়াছিল।

এই মানুষটী জগতের আর সব মানুষ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। এমন সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি উর্মি দেখিতে পায় নাই, তাহার মন স্বভাবতঃই এই শুভ্রবসনা মাতৃ-মূর্ত্তির পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

মাও এই মেয়েটীকে একটু ভালোবাসিয়াছিলেন। এই বঞ্চিতার সকল কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহার সব হারানোর ব্যথা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জানিতেন মানুষই মানুষকে পিশাচরূপে পরিবর্ত্তিত করে, আবার দেবতারূপেও পরিণত করে। মানুষকে বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিণত করে এই মানুষই; দুনিয়াকে মানুষই স্বর্গরূপে গড়ে আবার নরকও করে।

এই ক্ষুদ্র পরিবার, মা ও ছেলে,—কত কষ্টে যে দিন যায় তাহা উর্ম্মি নিজের চোখেই দেখিতে পাইত। তাহার নিজের অতুল বৈভব থাকিলেও সে সাহস করিয়া এতটুকু কিছু দিয়া সাহায্য করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই।

জয়ন্তের মায়ের যে সামান্য পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাতে জানিয়াছিল—কলিকাতা হইতে দূরে এক গ্রামে ছিল তাঁহার শ্বশুরালয়, পিত্রালয় কাছাকাছি কোন এক গ্রামে ছিল। স্বামী ছিলেন সেখানকার জমিদার-বংশের কুলপুরোহিত। বহুযুগ হইতে বংশপরম্পরায় তাঁহারাই ছিলেন এই মন্দিরের সেবক, এবং ইহারই আয়ে তাঁহাদের সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত।

কোন একটা দুর্বিপাকে পুরাতন জমিদারকে জমিদারি বিক্রয় করিয়া দিতে হয় এবং সে জমিদারি ক্রয় করেন ভবেশ চৌধুরী নামক একজন লোক, তিনি বিলাত ফেরত, সম্পূর্ণ বৈদেশিক ভাবাপন্ন ঠাকুর দেবতায় তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। কয়দিন তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন সে কয়দিন বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা রীতিমত হইত, মন্দিরে রাধারমণ জিউয়ের পূজাও নিয়মিত চলিত, তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়ীর ঠাকুরকে মন্দিরে তুলিয়া দিয়া ভবেশ চৌধুরী নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

কুলপুরোহিত বাধা দিয়াছিলেন, স্পষ্টই তাঁহাকে শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, তখনকার দিনের উদ্ধত ভবেশ চৌধুরী দরিদ্র পুরোহিতের এই স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারে নাই—জয়ন্তের পিতাকে তিনি সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন।

জয়ন্ত তখন মাত্র চার বৎসরের শিশু।

পুরোহিতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের পিতা পিতৃপুরুষের ভিটায়

বাস করিবার অধিকারও হারাইয়াছিলেন। নিতান্ত নিরুপায় ব্রাহ্মণ পত্নী ও পুত্রসহ কলিকাতায় আসেন এবং কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া উদরান্নের সংস্থান করেন।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর তিনি মারা গিয়াছেন।

সম্পূর্ণভাবে পরের সাহায্যের উপর এই পরিবারটী চলিতেছে। জয়ন্ত বৃত্তি লইয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল তাহাতে তাহার আই, এ, পড়ার কতকটা সাহায্য হইয়াছিল;—এইভাবে সে বি, এ, পরীক্ষাও দিয়াছিল।

বরাবর সংস্কৃতের উপর তাহার ঝোঁক ছিল,—বি, এ, পরীক্ষার পরে সে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত হইল—এবং কিছুদিন পরে সাংখ্যতীর্থ উপাধি লইয়া মাথায় একটা শিখা রাখিল।

উর্ম্মি জয়ন্তকে দেখিয়াছে।

জ্যোতিপূর্ণ ব্রাহ্মণ,—দীর্ঘ, সুগঠিত বলশালী দেহ, প্রতিভার জ্যোতি তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠে। মহাদেবের যে মূর্ত্তির বর্ণনা সে পড়িয়াছে, মনে কল্পনা করিয়াছে, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে এ মূর্ত্তির সম্পূর্ণ মিল সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। উর্ম্মি গোপনে এই তেজপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করে—গোপনে প্রণাম করে।

মানুষের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা অল্পে অল্পে মুছিয়া আসিতেছিল, এই সময়ে মা মারা গেলেন।—

বেচারা জয়ন্ত—

তাহার কথা ভাবিয়া উর্ম্মির সারা অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—এই আত্মভোলা ছেলেটী হয়তো কোথায় ভাসিয়া যাইবে—সে তাহা ভাবিয়া সত্যই কষ্ট পাইয়াছিল।

। নিজে সে কিছুই জানিত না; মাসীমার নিকট হইতে হবিষ্যের নিয়মাবলী জানিয়া লইয়া সে নিজেই উপযাচিকা হইয়া জয়ন্তকে সাহায্য করিতে গিয়াছিল, কিন্তু জয়ন্ত যে তাহার ভালো দিকটা না দেখিয়া তাহাকে এমন নিদারুণ ভাবে আঘাত করিবে তাহা সে জানিত না। উর্ম্মি হইয়া উঠিল অত্যন্ত কঠোর;—মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় আচরণ তাহাকে আবার অনেকখানি নামাইয়া আনিল।

৩

যে কোন রকমে জয়ন্ত শ্রাদ্ধ শেষ করিল—এইবার সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল।—

লোকে কথায় বলে—পিতৃমাতৃ দায়ং সে কথার সত্যতা জয়ন্ত এখন বেশ বুঝিয়াছে।

এখন চলিয়াছে ঘর ভাড়ার ভাবনা,—

আজই সকালে ও বাড়ীর সরকার আসিয়া নোটিস দিয়া গিয়াছে গত পাঁচ মাসের ভাড়া জয়ন্তকে এক মাসের মধ্যে মিটাইয়া দিতে হইবে।

সেদিনকার অপমানের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ।

তবু তো এক মাস সময় দিয়াছে, এত লম্বা সময় না দিলেই বা কি হইত; জয়ন্ত যে কত কষ্টে এ টাকা সঞ্চয় করিবে সে খবর কে রাখে?

জয়ন্ত তাহা বুঝিয়াছে।

পাঁচ মাসের ভাড়া সাতটাকা হিসাবে পঁয়ত্রিশ টাকা হয়, জয়ন্তের হাতে পঁয়ত্রিশ পয়সা নাই। মায়ের ছোট লাল বাক্সটা সে ইহার আগেও

দুই একবার খুঁজিয়াছিল, আবার সেদিন খুঁজিতে বসিল—যদি কিছু পাওয়া যায়।

শূন্য বাক্স, ছিন্ন দুই একখানি কাপড় ছাড়া আর কিছু নাই।

তাহার এক বন্ধু বালিগঞ্জে বাস করে, তাহারই সন্ধানে সে হাঁটিতে হাঁটিতে বালিগঞ্জে গিয়া পৌঁছাইল। সংবাদ লইয়া জানিল বন্ধু আজ দুইদিন হইল কৃষ্ণনগরে গিয়াছে, কবে ফিরিবে ঠিক নাই।

পথ দিয়া চলিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, জয়ন্তের চলার পথে বাঁদিকে একটী সুদৃশ্য বাড়ী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গেটের সামনে একটা পিত্তল ফলকে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা আছে মিঃ ভবেশ চৌধুরী জমিদার গোপালপুর।

ভবেশ চৌধুরী গোপালপুর,—

মনে পড়িল এই গোপালপুর তাহার জন্মভূমি,—কেবল তাহার নয় তাহার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি, পিতৃপুরুষের ভিটা এই গোপালপুরেই ছিল। আজ হয়তো সে বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নাই, তবু মাটি পড়িয়া আছে। মা গল্পচ্ছলে এই ভবেশ চৌধুরীর অনেক কথা বলিয়াছিলেন,—তিনি তাহাকে তাহার পিতৃপুরুষের ভিটায় ফিরিবার আদেশ দিয়াছেন।—

ভবেশ চৌধুরী একদিন পুরোহিতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন—সে অপমান জয়ন্তের বুকেই বাজে—জয়ন্তের বুকের মধ্যে গরম রক্ত টগবগ করিয়া ফুটে।

পিতা সে অপমান বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, জয়ন্ত হইলেও পারিত না। পিতা নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়াছিল, জয়ন্ত নিঃশব্দে আসিত না, ভবেশ চৌধুরীকে কিছু শিক্ষাদান করিত, জোর করিয়া পূজা করিত, কিছুতেই নিজের অধিকার ছাড়িত না।

দেবতা বা পুরোহিতের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবার শক্তি ভবেশ চৌধুরীর নাই।—তিনি বিদেশী চালচলনে অভ্যস্ত।—দেশীয় যে কোন প্রথা যে কোন জিনিসকে তিনি ঘৃণা করেন—মায়ের মুখে যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে জয়ন্ত তাঁহার এই পরিচয়ই পাইয়াছে।

দেব-মন্দির সর্ব্বসাধারণের জিনিষ স্থানীয় জমিদার নাম মাত্র ইহার মালিক। দেব-মন্দিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাহার ছিল না, প্রতি মাসে নিয়মিত কয়েকটী টাকা দেবতার পূজার জন্য দিতে হয় মাত্র, তাহাই ছিল দেবত্র আয়।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বংশগত অধিকার তাহার চাই-ই, সহজে সে তাহার অধিকার ছাড়িবে না। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আজ প্রায় দুইশত বৎসর ব্যাপিয়া যে বংশ দেবতার পূজা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জোর আছে বই কি। তাহারা দেবতার পূজক—সেবক, মানুষের আদেশ পালন করিতে তাহারা বাধ্য নয়।

ভবেশ চৌধুরী—বর্ত্তমান জমিদার—

জয়ন্ত দাঁতের উপর দাঁত রাখিল।

জমিদারদের অত্যাচার কাহিনী চির প্রসিদ্ধ যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহারা প্রজাদের রক্ষা করার নামে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। কদাচিত কোন নিঃস্বার্থ হৃদয় জমিদারের নাম শুনা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত কম যে কিছুই নয় বলা যায়। দরিদ্র চিরদিন ধনীর নির্য্যাতন সহিয়া যায়, দুর্ব্বলকে চিরদিন সবল পায়ের তলায় চাপিয়া রাখে; তাই মদান্ধ জমিদারেরা দরিদ্র প্রজাদের শাস্তি দিয়া বশে রাখিতে চান।

পিতা ছিলেন শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী, কোলাহল প্রিয় ছিলেন না, বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে থাকিতে চান নাই, তাই আস্তে আস্তে পিতৃপুরুষের ভিটা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

জয়ন্ত গেটের কাছে দাঁড়াইল।

দ্বারোয়ান টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিল, জয়ন্তকে দেখিয়া সোজা হইয়া বসিল—।

ধনীর দ্বারোয়ান নগ্নপদ, মুণ্ডিত মস্তক জয়ন্তকে দেখিয়া তাহাকে এতটুকু সম্মান দেখাইবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। এমন অনেক প্রার্থী এখানে আসে, সাহেবের সহিত একবার দেখা করাইয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করে, দ্বারোয়ান তাহাদের তাড়াইয়া দেয়।

রুক্ষভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দ্বারোয়ান মাথা নাড়িল—"সাহেব এখানে নেই—দেখা হবে না।"

কোথায় গিয়াছেন—কবে দেখা হইতে পারে—অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও জয়ন্ত কোন উত্তর পাইল না—শেষ পর্য্যন্ত দ্বারোয়ানের তর্জ্জন গর্জ্জনে তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

পথে নামিতেই দেখা হইয়া গেল—তাহার এক সমপাঠীর সহিত, একসঙ্গেই তাহারা বি, এ, পাস করিয়াছে। জয়ন্তকে এখানে দেখিয়া বিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল,—"জয়ন্ত যে, হঠাৎ একেবারে বালিগঞ্জে—আমাদের চৌধুরী সাহেবের গেটে? চাকরী টাকরীর চেষ্টা নাকি?"

শুষ্ক হাসিয়া জয়ন্ত বলিল, "পেলে তো ভালোই হয়, কিন্তু দেখাই মিললো না যে। দ্বারোয়ানের কাছ হইতে মোলায়েম বাত শুনে ফিরতে হচ্ছে।"

বন্ধু রঞ্জন চিন্তিত মুখে বলিল,"পাবে কি করে তিনি তো তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জমিদারীতে বেড়াতে গেছেন। আমাদের দু-তিনটী বন্ধুও গেছে যদি শিকার মেলে এই আশা নিয়ে,—আমারও যাবার কথা ছিল বটে—যাইনি। তিনি মাঝে মাঝে একা সেখানে গেলেও তাঁর মেয়ে মিলা কোনদিন যায়নি, এবারে সে গেছে তাঁর সঙ্গে। বেশীদিন থাকতে হবে না কারণ মিলা গেছে শুধু সখের খাতিরে দুই একদিনের জন্যে, যে মেয়ে তাকে দু-চার দিনের বেশী সেখানে থাকতে হবে না।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তুমি বুঝি জুটমিলে কাজ করতে চাও? সেখানে যে সব ছোটলোক, কাজ করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

জয়ন্ত হাসিল, বলিল, "যে গরীব সেই হয় ছোটলোক, আমিও তা ছাড়া নই কারণ আমিও গরীব। যে জুটমিলের কথা বলছো সেটাতে ভবেশ চৌধুরীর—"

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, "তিনি সিনিয়ার পার্টনার, অর্দ্ধেকের বেশী শেয়ার হোল্ডার,—তাঁর যতখানি কথা এতে চলে, ততটা আর কারও চলে না।"

জয়ন্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দেখি, যদি চাকরী করতে হয় খোঁজ করব।"

সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইল।

আর কিছু জানিবার দরকার তাহার ছিল না, সে যাহা জানিয়াছে তাহাই তাহার যথেষ্ট।

৪

উর্ম্মি স্যুটিং হইতে ফিরিয়াছে।

সকালেই সে বাহির হইয়াছিল,—গিয়াছিল কলিকাতার বাহিরে একটী গ্রামে। এমনইভাবে আউটডোর স্যুটিংয়ে আজকাল তাহাকে প্রায়ই যাইতে হয়। আহারাদির ব্যবস্থা সেখানেই থাকে কিন্তু সে কোনদিন সেখানে আহার করে না।

স্নানান্তে সে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ঠিক করিতে করিতে ভাবিতেছিল।

আজ সে যে পার্ট লইয়া অভিনয় করিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার প্রাণে বেশ একটু আঘাত দিয়াছে। গ্রামের মেয়ের রূপে সে অভিনয় করিয়াছে, একটি পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর অংশে তাহাকে নামিতে হইয়াছে এইটিই ছিল মেনপার্ট এবং তাহার এই অংশ অভিনয় নাকি অনিন্দ্যনীয় ও অতি প্রাণবন্ত হইয়াছে।

ম্যানেজার উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিয়াছেন—এমন জীবন্তভাবে উর্ম্মি অভিনয় করিয়াছে যাহার কল্পনাও তাঁহারা কেহ কোনদিন করিতে পারেন নাই।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এই সুন্দরী অভিনেত্রীটি চিত্র জগতে যুগান্তর আনিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক পার্ট সে এমন নিখুঁত ভাবে অভিনয় করিয়া যায় যাহাকে অভিনয় বলিয়া ধরা যায় না।

উর্ম্মি কিন্তু এত প্রশংসায় শান্তি বা তৃপ্তি কিছুই পায় নাই।

মানুষের উপর রাগ করিয়াই সে এ পথে আসিয়াছে সেই মানুষকে তৃপ্তি দিয়া, আনন্দ দিয়া তাহার কি লাভ? ফিরিয়া স্বস্থানে আসিবার

জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, ছুদিনের মোহ তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। কন্ট্রাক্ট যদি না থাকিত সে এতদিন ফিরিয়া আসিত, কেবল কন্ট্রাক্টের জন্যই সে বাধ্য হইয়া ষ্টুডিওতে আসা যাওয়া করিতেছে।

আজ সকালে উর্ম্মি এমন একটা দৃশ্য দেখিয়াছে যাহা সে ভুলে নাই, এখনও তাহার কথা ভাবিতেছে।

নিজেই সে গাড়ী করিয়া যাইতেছিল—গ্রামে পৌঁছাইয়া সে হাঁটিয়া চলিতেছিল, কারণ গত রাত্রে ঝড় হইয়া গাছ পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে প্রতিপালিতা, দরিদ্র গৃহস্থের বধূর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে কি ভাবে চলাফেরা করিতে হয়, কুটিরের অবস্থা কিরূপ হইবে ইহাই দেখিবার জন্য সে পথের ধারে এক কুটিরে জল পানের অছিলায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই স্থানে দেখা মিলিল তাহার পার্টের নায়িকার—। উর্ম্মি যাহা করিয়াছিল অভিনয় মাত্র, এই পর্ণ কুটিরে তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল জীবন্ত! দুঃখের এমন মূর্ত্তির কল্পনা উর্ম্মি কোনদিন করিতে পারে নাই,—কেবলমাত্র বই পড়িয়া, লোকের মুখে শুনিয়া সে যাহা ধারণা করিয়াছিল, তাহা সত্যই কল্পনা মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার পার্থক্য যে অনেকখানি তাহা উর্ম্মি আজই মাত্র বুঝিয়াছে।

আজ অভিনয় করিতে সুরু করিয়া উর্ম্মি যে ছবি মন হইতে মুছিতে পারে নাই, তাই তাহার অভিনয় হইয়া উঠিয়াছে সাফল্যমণ্ডিত, অতি সুন্দর এবং স্বাভাবিক।

এই মুহূর্ত্তে অভ্যাসের বশে প্রসাধন করিতে গিয়া উর্ম্মি হঠাৎ থামিয়া গেল,—মনে পড়িল আজ যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে তাহার কথা।

বাহিরে আকাশে ঘন কালো মেঘ নামিয়া আসিয়াছে, মাঘের প্রবল শীতে গরমজলে স্নানান্তে সে কতকগুলা গরম কাপড় গায়ে জড়াইয়াছে। এখনই হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে, ঠাণ্ডা বাতাস বহিবে, উর্ম্মি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গরম আরামে গদি বিছানায় ঘুমাইয়া রাত্রিযাপন করিবে। বৃষ্টির ঝুপ ঝুপ শব্দ তাহার মনে প্রাণে আনিবে পরম তৃপ্তি, আনিবে আনন্দ উৎসাহ—।

আর সেই পল্লীগ্রামের মেয়েটী—

এই সন্ধ্যায় কলিকাতা সহর ইলেকট্রিক আলোকে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, পল্লীগ্রামে এতক্ষণ নামিয়া আসিয়াছে ঘন কালো অন্ধকার, মৃত্যুর মত শান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল। সেই অন্ধকারে আকাশে একটী নক্ষত্র ফুটে নাই,—আকাশ ও পৃথিবী একাকার হইয়া গেছে। বাতাসের প্রবলতা এখানে অনুভূত হইতেছে না, কিন্তু সেখানে হয়তো গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঘরের মটকা হয়তো উড়িয়া গিয়াছে। এখনি সে গ্রামের বুকেও মুষলধারে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিবে, বেড়ার দেয়ালের ফাঁক দিয়া, উপরের চালার ছিদ্র দিয়া ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিবে।

সেই ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেঝের উপর একখানা সামান্য বিছানার উপর পড়িয়া আছে একটী রোগী। তাহার মাথার কাছে একটী মেয়ে বসিয়া; ঘরের কোণে প্রদীপটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকার আরও ভীষণ দেখাইতেছে।

উর্ম্মি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতের পাউডারের কৌটা নামাইয়া রাখিল।

ক্ষুধা ছিলনা তবুও খোকদার একান্ত অনুরোধে খাইতে বসিতে হইল, দুই গ্রাস মাত্র খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

মোক্ষদা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'ওকি কিছু না খেয়েই যে উঠে পড়লে মা—?"

উর্ম্মি বলিল, "খেতে ইচ্ছে করছে না মাসীমা, শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।"

মোক্ষদা রাগ করিল, বলিল, "শরীরের আর অপরাধ কি? সকাল হতে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অমনভাবে ছুটোছুটি করলে শরীর টিঁকবে কি করে? আমি বার বার তখনই বারণ করলুম—"

উর্ম্মি হাসিল, বলিল, "বারণ করলেই বা কি মাসীমা—আমি কি নিয়ে, কেমন করে দিন কাটাব ভাব দেখি? মানুষ একটা কিছু উপলক্ষ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, আমি কি নিয়ে বাঁচব বল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, ও বাড়ীর ভাড়াটিয়া আসিয়াছে, বিশেষ দরকারে একবার দেখা করিতে চায়।

বিরক্ত হইয়া উর্ম্মি বলিল, "এখন যেতে বলে দাও, জানিয়ে দাও আমি রাত্রে কারও সাথে দেখা করিনে, যার যা দরকার থাকে সকালে এসে জানাতে বলো।"

দাসী চলিয়া গেল।

কুঞ্চিত মুখে একখানা বই টানিয়া লইয়া উর্ম্মি অন্যমনস্ক ভাবে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। দাসী আবার দরজার পর্দ্দা সরাইয়া উঁকি দিতে উর্ম্মি তিক্তকণ্ঠে বলিল, "আবার কি?"

দাসী বলিল, "ও বাড়ীর সেই ভাড়াটে দিদিমণি,—যার মা সেদিন মারা গেছে। বলছে বিশেষ দরকারে আজ এই রাত্রেই সে দেখা করতে চায়, কাল সকালে সে আসতে পারবে না, ভোর বেলাই কোথায় চলে যাবে।"

"চলে যাবে—এখনও তো এক মাসের ভাড়া দেয়নি—"

ঊর্ম্মি বিবর্ণ মুখে দাসীর পানে চাহিল, বলিল, "আচ্ছা তাঁকে বসতে বল গিয়ে, আমি আসছি।"

মিনিট পাঁচেক সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে সে কাহারও সহিত দেখা করে না, যে কোন লোক মাত্রেই এ কথা জানে। জয়ন্তকেও সে ফিরাইয়া দিত, কিন্তু কাল সকালেই সে চলিয়া যাইবে, আজ কি বলিয়া যাইতে চায় জানিবার জন্য তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইতে হইল।

বাহিরের ঘরে জয়ন্ত একা বসিয়াছিল, সম্মুখে কয়েকখানা বই রহিয়াছে—। ঊর্ম্মি দরজার পর্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল,—জয়ন্ত একবার তাহার পানে চাহিল মাত্র। কি যেন সে ভাবিতেছিল, তাহার চিন্তামগ্ন মুখ উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি দেখিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ঊর্ম্মি একখানা চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল; জয়ন্ত কোন কথা বলে না দেখিয়া সে ভারি অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন শুনতে পাই কি?"

হঠাৎ যেন জয়ন্ত চমকাইয়া উঠিল,—চোখ নামাইয়া সে ঊর্ম্মি উপর রাখিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ একটা বিশেষ দরকারেই এসেছি, নইলে এই রাত্রে এসে বিরক্ত করতুম না।"

ঊর্ম্মি বলিল, "কি দরকার একটু তাড়াতাড়ি বলুন—আমার ওদিকে কাজ আছে।"

জয়ন্ত বলিল, "আমি কাল সকালেই এখান হতে চলে যাচ্ছি। তোমার ঘরের ভাড়া কয়েকমাস দেওয়া হয়নি, না জানিয়ে হঠাৎ চলে গেলে তুমি

নিশ্চয় বলবে আমি জোচ্চোর, তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে ভাঁড়া না দিয়ে পালিয়েছি। কেবল সেই জন্যই আমি এই রাত্রে এখানে আসা খারাপ জেনেও আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি নিজেও এর জন্যে সঙ্কুচিত বড় কম হইনি।"

ঊর্ম্মির মন যে পরিমাণে কোমল হইয়া আসিয়াছিল, জয়ন্তের শেষ কথা শুনিতে ঠিক ততখানিই কঠিন হইয়া উঠিল, সে কঠিন ভাবে বলিল, "ও সব কথা থাক, আপনি যা বলতে এসেছেন তাই বলুন।"

জয়ন্ত সামনের বইগুলা দেখাইয়া বলিল, "আমি এই বইগুলো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি সামান্য টাকার জন্যে আমাকে বই বাঁধা রাখতে হবে, কিন্তু শেষে তাও করতে হল। এ সব বই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও পড়বার অধিকার নেই, নেহাৎ বাধ্য হয়ে তোমার কাছে পর্য্যন্ত রেখে যেতে হচ্ছে—"

সে মলিন মুখে বইয়ের প্গানে তাকাইল।

ঊর্ম্মির মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে সাধারণে যা ধারণা করেছে, আপনিও তাহা করেছেন মাত্র, এতে আপনাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। আপনার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি আমার কাছে সামান্য কয়টা টাকায় বন্ধক না রেখে অন্য লোকের কাছে রেখে এ টাকা কয়টা এনে দিলে ভালো হতো।— আপনার বই নেওয়ার মত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব তো দেশে নেই—"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া তিক্তকণ্ঠে সে বলিল, "গল্প শুনেছি—বাঘের চামড়া গায়ে চড়িয়ে একটা গাধা গর্জ্জন করেছিল, লোকে তাকে দেখে বাঘ বলেই ভেবেছিল। আপনার ব্রাহ্মণেরাও ঠিক তেমনি একটা

আবরণ টেনে দিয়েছেন সারা দেহে 'পরে। তাঁরা অত্যন্ত ভালোমানুষ, তাঁরা যথার্থ সাধু, কিন্তু যখন কোন আঘাত লেগে তাঁদের সে আবরণ খুলে পড়ে তখন দেখা যায়—যাদের সমাজের সকলের চোখে ঘৃণিত লাঞ্ছিত করে তাঁরাই রেখেছেন, তাদের সঙ্গে এতটুকু পার্থক্য নেই।"

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল, "হতে পারে হয় তো এমন ব্রাহ্মণ দুই একজনকে তুমি দেখতে পেয়েছো, তাই বলে মনে কোরোনা—সকলেই ঠিক এক সমান, সকলেই উপরে আবরণ দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে সকলের মধ্যেই ভালোমন্দ আছে, একজনকে ধরে সকলের বিচার করা চলে না।"

উর্ম্মি চুপ করিয়া রহিল,—

জয়ন্ত বলিল, "এ সব কথা থাক আগে আমার কথাগুলো শেষ হোক আমি বইগুলো আর কারও কাছে দিইনি—জানি সে সব জায়গায় হয়তো এ বইগুলো তুলে রাখা হবে না, তারা পড়বে, সেইজন্যে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি—"

উর্ম্মি হাসিয়া ফেলিল,—সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া কোন মতে হাসিটাকে গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমিই যে হাত দেব না— পড়ব না তারই বা ঠিক কি,—আপনি আমার ভারাটে বলেই কি আমাকে বিশ্বাস করছেন?"

জয়ন্ত মাথা নাড়িল, "না, সেজন্যে নয়। তুমি—কথাটা অবিশ্যি বলা কিছু খারাপ কিছু রূঢ় হবে, তবু না বলা ছাড়া বুঝবে না বলেই বলছি, তুমি সমাজের বাইরের মেয়ে, ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই—পাপ পুণ্যকে নিশ্চয়ই মেনে চলবে—সেই বিশ্বাসে তোমার কাছেই বই রেখে যাচ্ছি।"

উর্ম্মি গম্ভীরভাবে বলিল, "ধরুণ, আমি এগুলোর কোন মর্য্যাদাই রাখব না—কারণ সত্যই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি জানিনে। সেটা আপনিও জানেন তবু জেনে শুনে আমারই কাছে আপনার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ রেখে যাওয়ার অর্থ কিছুই হয় না। ওর মর্য্যাদা যে আমার মত পতিতা মেয়ে রাখবে আপনি কি করে তা নিশ্চয় জানলেন? জানেন তো— ধর্ম্ম, বিবেক, ন্যায়, সত্য, এসব কথার কোন মূল্যই আমাদের কাছে নেই?"

জয়ন্ত কতক্ষণ শূন্য নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বইগুলি তুলিয়া লইল।

আশ্চর্য্য হইয়া উর্ম্মি বলিল, "আবার ওগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?"

জয়ন্ত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "দেখি, আর কোথাও রেখে টাকা পাওয়া যায় কি না।"

উর্ম্মি হাসিল, বলিল, "এই কথাটা বললেই হতো—এই পুরোনো বই টাকা দিয়ে কেউ বাঁধা রাখবে না—অতটা রাগ আর নাই দেখালেন— রেখে দিয়ে যান, ওতে কেউ হাত দেবে না কথা দিচ্ছি।"

জয়ন্ত কালো মুখে বই নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "এ কথার পরে আর না রাখাই উচিত ছিল, কেবল কাল সকালেই যেতে হবে বলে রেখে গেলুম। আমি যদি কাজ পাই, যত শিগগীর পারি টাকা দিয়ে বই নিয়ে যাব সেজন্যে ভাবনা নেই।"

সে বই রাখিয়া অগ্রসর হইল।

পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে উর্ম্মি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন—?"

জয়ন্ত উত্তর দিল, "কোন ঠিক নেই। তুমি এক বছর অপেক্ষা করো, যদি না আসি যা দামে হয় বই বিক্রী করে দিয়ো, এ সব বইয়ের

গ্রাহক তুমি পাবে। আর আমি যদি কাজ পাই—টাকা জোগার করতে পারি, এর মধ্যেই টাকা দিয়ে বই নিয়ে যাব।"

সে বাহির হইয়া গেল—

উর্ম্মি দরজায় দাঁড়াইয়া সামনের লম্বা পথের পানে তাকাইয়া রহিল সে কি ভাবিতেছিল কে জানে।

৫

গ্রামের জমিদার ভবেশ চৌধুরী।

কেবল জমিদারই তিনি নয়, একটা জুটমিলের প্রতিষ্ঠাতা এব ডিরেক্টার; এ ছাড়াও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত কলিকাতায় থাকিতে একটা দিনও তিনি বিশ্রামের অবকাশ পান না— সেইজন্য একা তিনি মাঝে মাঝে দুই একদিনের জন্য গ্রামে চলিয়া আসেন —বিশ্রামও চলে, জমিদারীর কাগজপত্রও দেখা চলে।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী একসঙ্গে তাঁহার উপর আশীষ ঢালিয়া দিয়াছেন নিজে তিনি শিক্ষিত,—অর্থাগমের উপায় তিনি জানিতেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদার যখন নিরুদ্দেশ হইয়া যান, তাঁহার সম্পত্তি সম্পর্কী ভাগিনেয় লাভ করেন, কিন্তু তিনি এ সব ঝামেলার মধ্যে না থাকিয় নামমাত্র মূল্যে এ সব ভবেশ চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়া দেন,—সে আ একুশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

শুনা যায় পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদার তাঁহার স্ত্রীকে কি কারণে হত্যা করিয় ছিলেন, তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট আছে, পুলিস কোথাও তাঁহার সন্ধান পায় নাই। তিনি জীবিত কি মৃত তাহা কেহই বলিতে পারে না—তাঁহা

পরম বন্ধু ভবেশ চৌধুরীও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তাঁহার একমাত্র শিশু কন্যার জন্য ভবেশ চৌধুরী অনেক খোঁজ করিয়াছিলেন কোন সন্ধান মিলে নাই।

আজ ভবেশ চৌধুরী এখানকার জমিদার।

তাঁহার একমাত্র কন্যা মিলা জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত গ্রামে কোনদিন আসে নাই,—বালিগঞ্জে সে পিতার নিকটেই থাকিত। এবার সে পিতার সঙ্গে আসিয়াছে, সঙ্গে আসিয়াছে তাহার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব, তাহারা শিকার করিবার জন্য বন্দুক গুলী সব আনিয়াছে।

বাল্য হইতে সে মানুষ হইয়াছে জনৈকা মেম গভর্ণেসের তত্ত্বাবধানে। সে যখন মাত্র পাঁচ বৎসরের তখন তাহার মাতা মারা যান, মাতৃহীন কন্যার ভার গভর্ণেসের হাতে দিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হন।

নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকায় কন্যার দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না, সে কিরূপভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাও তিনি কোনদিন দেখেন নাই। ফলে পিতার সহিত কন্যার প্রীতিময় মধুর সম্পর্ক তেমন ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পিতা নিজের কাজ লইয়া বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, কন্যাও তাহার লেখাপড়া, বিলাসিতা ইত্যাদি লইয়া একদিকে গিয়াছিল।

নিজের স্ত্রীকে খাঁটি মেমসাহেব-রূপে গড়িয়া তুলিবার আশা ভবেশ চৌধুরীর ব্যর্থ হইয়াছিল, স্বামী বিলাত হইতে খাঁটি সাহেব-রূপে ফিরিয়া আসিলেও স্ত্রী তাঁহার সহচারিণী হইতে পারেন নাই, স্বামী তাঁহাকে গৃহের লক্ষ্মীরূপে পাইলেও বাহিরে সঙ্গিনীরূপে পান নাই। এই লইয়া চলিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনান্তর, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া সে মনান্তরের অবসান করিয়া দিয়াছিল।

পাঁচ বৎসরের যে মিলাকে মা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে মিলার নূতন [illegible]য়া জন্ম হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৃহে জন্মিয়াও সে চালচলনে পুরা মেম-[illegible]হেব হইয়া উঠিয়াছে। টেনিস খেলিতে, ঘোড়া ও মোটর রেস দিতে, [illegible]তে মিশিতে তাহার মত খুব কম মেয়েই পারে। বাঙ্গালীর নিজস্ব [illegible]ধারা তাহার মধ্যে নাই, শান্ত সংযম তাহার মধ্যে নাই—কাহারও [illegible] সে চলিতে বাধ্য নয়, একান্তভাবে নিজের মতই সে নিজেকে সৃষ্টি [illegible]রিয়া লইয়াছে।

আজ কন্যার এই পরিবর্ত্তন পিতার চোখে ঠেকে, দিন যত যাইতেছে, [illegible]মানের সহিত অতীতের তুলনা করিয়া অতীতকে সমৃদ্ধ এবং বর্ত্তমানকে [illegible]শাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

মনে হয় মিলাকে এমনভাবে না গড়িলেই ভালো হইত। বাঙ্গালীর মেয়ের বাঙ্গালীর ভাবে শিক্ষা দেওয়াই ভালো ছিল। নিজের সেই হারানো অতীতের পানে তাকাইয়া ভবেশ চৌধুরী আজ নিঃশ্বাস ফেলেন।

[illegible]দিন যৌবন সূর্য্য যখন তাঁহার জীবনে উদিত হইয়াছিল, তাহার দৃপ্ত [illegible]শ্মিতে তাঁহার চারিদিক ঝলসাইয়া গিয়াছিল, দূরে যে অন্ধকার জমাট [illegible]দিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। আজ সে সূর্য্য [illegible]মে হেলিয়া পড়িয়াছে, অন্ধকার নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, [illegible]ন তিনি আশ্রয় চান, কিন্তু সেইটুকু আশ্রয় দিবার লোক তাঁহার [illegible] নাই।

একদিন অনেক আশাই তাঁহার মনে ছিল, সেদিনে যে মোহের অঞ্জন পাশ্চাত্য তাঁহার চোখে পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অঞ্জনমাখা চোখে তিনি [illegible]কেও সোনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সেদিন তিনি ভাবেন নাই একদিন কৃতকর্ম্মের ফল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে,—তিনি সেদিন শুধু

চাহিয়াছিলেন তাঁহার মিলাকে সর্ব্বাংশে পাশ্চাত্যের মত গড়িয়া তুলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিবেন।

নিজের এই আত্মদানের দৃশ্য সেদিন চোখে পড়ে নাই, পড়িয়াছে এখন। শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে ঘরে ফিরিতে গিয়া তিনি ঘর দেখিতে পান নাই, তিনি একবার ডাক দিতে কেহ ব্যাগ্রভাবে ছুটিয়া আসে নাই।

অতীতের কথা মনে হয়,—মা, পিসিমা, ভগিনী, অবশেষে স্ত্রী। বাংলার মেয়ে, তাঁহারা চিরদিন পুত্র, স্বামী, ভাইয়ের সেবা তৎপরা,—কোনদিন তাঁহাদের কৃতকর্ম্মে এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নাই। সেখানে ছিলনা কোন বাধ্য-বাধকতা, ছিল শুধু স্নেহের আকর্ষণ।

কন্যা পিতার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, পিতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, এ দৃশ্য তো নূতন নয়। পিতা সেবাপরায়ণা কন্যার হাতে নিজের ভার ছাড়িয়া দিয়া কতখানি আরাম, কতখানি শান্তি পান,—তিনি স্বেচ্ছায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আজ জরাজীর্ণ দেহ চায় এতটুকু সেবা, অবসন্ন মন চায় এতটুকু স্নেহ, কে দিবে ?

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ভবেশ চৌধুরী সেদিন এই কথাই ভাবিতেছিলেন।

কাজের চাপে নিজের পানে তাঁকাইবার অবকাশ তাঁহার হয় না, তাই তিনি এবার দীর্ঘ এক মাসের জন্য গ্রামে আসিয়াছেন। কোনদিন তিনি গ্রামের কোন লোঁকের সাংসারিক জীবনযাত্রা কিভাবে নির্ব্বাহ হয় তাহা জানিতে চাহেন নাই, এবার নিজে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। পল্লীর মেয়েদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দেখিতে দেখিতে তিনি বর্ত্তমানকে হারাইয়া ফেলেন।

নূতন জমিদাররূপে পুরাতন জমিদার-ভবনে যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন সঙ্গে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী,—এই বাড়ীকে মনের মত করিয়া তিনি সাজাইয়াছিলেন। ও পাশের ওই ঘরখানি যাহাতে আজ তাঁহাদের জুতা ও পোষাক পরিচ্ছদ থাকে, সেই ঘরখানি ছিল পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদার বংশের কুলদেবতা রাধানাথের। স্ত্রী এ বাড়ীতে আসিয়াই পূজার আয়োজনের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই পূজার আয়োজনেই তাঁহার সারাদিন কাটিয়া যাইত। কতখানি নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সহিত কত পবিত্রভাবে তিনি ওই ঘরে পূজার আয়োজন করিতেন তাহা ভবেশ চৌধুরী ভুলিতে পারেন নাই।

মনটা বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

আজ সেই ঘর বিগ্রহ-শূন্য। স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া জোর করিয়া তিনি সে বিগ্রহ বাড়ী হইতে বিদায় দিয়াছেন। জমিদার বাড়ীর নির্ম্মিত দেব-মন্দিরে বাড়ীর দেবতা স্থান পাইয়াছেন, একত্রভাবে সেখানে সব দেবতার পূজা হয়।

স্ত্রীর সমক্ষেই তিনি সেই ঘরে বন্ধু-বান্ধব লইয়া বাবুর্চির প্রস্তুত নিষিদ্ধ মাংসাদি আহার করেন, স্ত্রী একটি কথাও তাঁহাকে বলেন নাই; কেবল হাত দু'খানা যোড় করিয়া কপালে রাখিয়াছিলেন, কম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর, ক্ষমা কোর—।"

ভবেশ চৌধুরী চলিতে চলিতে থামিয়া গেলেন, তাঁহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

ওদিক হইতে মিলা ও তাহার বন্ধুদের হাসি কথা ভাসিয়া আসিতেছিল—। ম্যানেজার অমূল্য মিত্র বন্দুক হাতে ত্রস্তপদে আসিতে আসিতে ভবেশ চৌধুরীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—

ভবেশ চৌধুরী চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বুঝি তোমরা শিকার করতে যাচ্ছো অমূল্য—?"

অমূল্য বলিল, "কি করি, ওরা ছাড়ছে না—"

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "যাও, কিন্তু বেশী দূরে যেয়ো না, নদীর ধারের দিকে যা কিছু পাও তাই শিকার করে ওদের সাধটা মিটুক।"

অমূল্য হাসিয়া চলিয়া গেল।

ভবেশ চৌধুরীর ভাবি-জামাতা অমূল্য,—তাঁহারই ষ্টেটের ম্যানেজার, ভবিষ্যৎ জমিদার।

শিকারীদল সদর্পে দূরের পথ বাহিয়া শিকারের সন্ধানে গেল, ইহাদের পানে তাকাইয়া ভবেশ চৌধুরী একটু হাসিলেন।

৬

খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ক্লান্তভাবে ভবেশ চৌধুরী বাড়ীর দিকে ফিরিলেন সেই মুহূর্ত্তে পাশের কুঞ্জের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাঁর সামনে দাঁড়াইল দীর্ঘকায় সুদর্শন একটী ছেলে। সে কেবল মাথাটা সামনের দিকে একটু অবনত করিল, শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আমার মনে হয় আপনিই জমিদার ভবেশ চৌধুরী, আপনার জন্যই আমি অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছি।"

ভবেশ চৌধুরী বিস্মিতভাবে ছেলেটীর পানে চাহিলেন,—বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্যে"—

জয়ন্ত উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আপনার জন্যে বেলা তিনটে হতে এখানে বসে আছি—"

বলিয়া সে পাশের লতাকুঞ্জটি দেখাইয়া দিল।

তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "দ্বারোয়ানকে দিয়ে আমাকে একবার খবর দিলে পারতেন—"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার দ্বারোয়ান কথা মোটে কানেই তোলে নি। আমায় গেট দিয়ে ঢুকতে না দেওয়ায় কেবল দেখা করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে বাগানের পাঁচিল টপকে আসতে হয়েছে, এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "যদিও কাজটা আপনার অন্যায় হয়েছে, তবু ক্ষমা করতে পারি। আমার মনে হচ্ছে আপনি এখানকার লোক নন, দূর হতে আসছেন—"

জয়ন্ত শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তাই, আমি কলকাতা হতে আসছি, আপনার কাছেই আমার দরকার।"

ভবেশ চৌধুরী পার্শ্ববর্ত্তী একখানা বেঞ্চে বসিলেন, বলিলেন, "কলকাতা হতে আমার কাছে আসছেন—নিশ্চয়ই কোন কাজের প্রার্থী হয়ে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সকলের আগে আমি আপনাকে একটা কথা জানিয়ে দিয়ে রাখি, আমি এখানে বৈষয়িক কোন ব্যাপারে জড়িয়ে থাকব না বলে ঠিক করে এসেছি। কলকাতার যা কাজ তা কলকাতায় ফিরে গিয়ে করব, কাজেই আপনার এতদূর কষ্ট করে আসাই মিথ্যে হয়েছে।"

তিনি ঠিকই জানিয়াছিলেন, এ ছেলেটী আর পাঁচজনের মত চাকরীর উমেদার, এই জানার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের উপর হইতে তাঁহার শ্রদ্ধা সরিয়া গেল।

মাত্র এক মাসের জন্য গ্রামে আসিয়াছেন, তাহাতেও রক্ষা নাই, তাঁহাকে কেহ শান্তিতে থাকিতে দিতে চায় না। তিনি এখানে আসিয়াছেন জানিয়া আশে পাশের লোকেরা কোন লোকের কোন সম্পর্ক ধরিয়া নিত্য চাকরীর জন্য যাতায়াত করে; বড় বিরক্ত হইয়াই তিনি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই জয়ন্ত বাধা দিল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভুল বুঝছেন, আমি কলকাতার কোন কাজের জন্যে প্রার্থী হয়ে আপনার কাছে আসিনি, আমি এসেছি এখানকার পৈত্রিক অধিকার নিতে, আমার পিতৃপুরুষের সেই কাজ—যা অন্যায়ভাবে আমাকে বঞ্চিত করে অন্যকে দেওয়া হয়েছে।"

ভবেশ চৌধুরী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বিস্ফারিত নেত্রে তিনি খানিকক্ষণ জয়ন্তের পানে তাকাইয়া রহিলেন, চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি এমন কাজ কখনও করিনি, কাউকে তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করেছি বলে আমার মনে হয় না।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন।

হ্যাঁ, মনে হইয়াছে বই কি,—হারাইয়া যাওয়া অতীতের বক্ষে কলঙ্ক-মাখা সেই যে দিনগুলি—যাহার স্মৃতি আজও তাঁহারও মনে জাগিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। তরুণ বয়সে এমন কি কাজ ছিল যাহা তিনি করেন নাই—যাহা ছিল তাঁহার অসাধ্য। আজিকার এই ভবেশ চৌধুরী ধীরভাবে নিজের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিতেছেন, সেদিন কেবল সকলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছেন, পিছনে একটীবার চান নাই। সেদিন তিনি কোন সংস্কার, কোনও নিয়ম মানেন নাই, সামাজিক অনুষ্ঠান তাঁহার নিকটে ছিল নিতান্তই তুচ্ছ, নিতান্তই অবহেলার জিনিস।

সেই হারাইয়া যাওয়া একটী দিনের কথা মনে আছে। মন্দিরের পূজক দীননাথ ভট্টাচার্য্যকে অপমান করিয়া বহুকাল আগে তিনিই তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক অধিকার হইতে তিনিই বঞ্চিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনা প্রতিবাদে সে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রাম ছাড়িয়া ভিটা ছাড়িয়া তিনি পুত্র এবং পত্নী সমভিব্যবহারে চলিয়া গিয়াছেন কোথায় কে জানে।

পৈত্রিক অধিকার হইতে এই একটী লোককে তিনি বঞ্চিত করিয়াছেন, দীন ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে জমিদার বলিয়া, মনিব বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল, কেবল এই একটী লোক তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে নাই।

আজ মনে হয়—অপরাধ এমন কিছু বেশী ছিল না যাহার জন্য তাঁহাকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাঁহার ভিটা সমভূমি করিতে পারা যায়। সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে বাড়ীর বিগ্রহ সেবা লইয়া নির্য্যাতন করা পুরোহিত দীননাথ সহ্য করিতে পারেন নাই, বাড়ীর বিগ্রহ মন্দিরে পাঠাইতে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাঁহার অপরাধ।

এই তুচ্ছ অপরাধে দাম্ভিক ভবেশ চৌধুরী তাঁহাকে কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন।

সেই দিনের কথা মনে করিয়া ভবেশ চৌধুরী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন,—

"তুমি কে, তোমার নাম, পরিচয় আমি জানতে চাই—"

উল্লাসভাবে তিনি জয়ন্তের পানে তাকাইলেন।

জয়ন্ত উত্তর দিল, "আমি মন্দিরের পুরোহিত দীননাথ ভট্টাচার্য্যের ছেলে—জয়ন্ত, পিতার অধিকার আমি চাই।"

ভবেশ চৌধুরী মাথা কাত করিলেন, এক মুহূর্ত্তে তিনি নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইলেন।

বলিলেন, "বুঝেছি কিন্তু—"

জয়ন্ত বাধা দিল, "এতে আর কিন্তু হতে পারে না। আমি কেবল আমার বাপের কাজই চাচ্ছি নে, আমার বংশগত অধিকার আমি পেতে চাই, আশা করছি তা পাব।"

ভবেশ চৌধুরী গম্ভীরভাবে হাসিলেন—"ধীরে, ধীরে, সব কথাটা আগে বুঝতে দাও—নিজে বোঝ, তারপর দাবী করো। পণ্ডিত লোকেরও মূর্খ ছেলে হয়ে থাকে, তবু সে উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের কাজ পাওয়ার দাবী করতে পারবে কি—আর করলেই পাবে কি ?"

জয়ন্তের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কঠিন কণ্ঠে বলিল, "দাবী করলেই পায় জানি, কিন্তু যাঁরা বিবেচক তাঁরা তাকে বাজিয়ে দেখে নেন সে পণ্ডিত কি মূর্খ, বাপের ত্যক্ত কাজ করবার উপযুক্ত কি না।"

ভবেশ চৌধুরী শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "সে কথা ঠিক—যোগ্যতা অযোগ্যতা দেখে বিচার করে নেওয়া চাই। অনেক সময় জ্ঞানী পণ্ডিতবংশে হস্তীমূর্খও দেখা যায়, শুদ্ধাচারী ধার্ম্মিকের বংশধরকে জেল খাটতে দেখা যায়, সেজন্যে কেবল বংশ বা কুল ধরে বিচার করা চলে না—শুধু ব্যক্তিত্ব দেখে বিচার করাই আমার মতে যুক্তি সঙ্গত ;—কেমন—ঠিক নয় কি ?"

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠস্বরকে খাদে নামাইয়া বলিল,—"আমি তো আগেই বলেছি সে রকম দেখা আশ্চর্য্য নয়—বিচিত্রও নয়। যাঁরা সত্যকার বিচারক হবেন, ন্যায্য বিচারই করবেন—"

ভূবেশ চৌধুরী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি তোমার শুধু সেইটাই দেখব, বংশ পরিচয় আমি দেখতে চাইনে।"

দৃপ্তকণ্ঠে জয়ন্ত বলিল, "কিন্তু আমি সেভাবে পরীক্ষা দেওয়াকে আন্তরিক ঘৃণা করি। আমি জানি আমার পৈত্রিক অধিকার লাভ করতে আমার বংশ পরিচয়ই যথেষ্ট—"

ভবেশ চৌধুরী হাসিলেন, দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া একটা আড়া-মোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "ইয়ংম্যান, টেম্পার লুজ করো না, বেশ শান্তভাবে আমার কথাগুলো ভেবে দেখ গিয়ে। বিলেতে বংশ পরিচয় ধরে ধর্ম্মযাজকের পদ দেওয়া হয় না, রীতিমত শিখতে হয়। তুমি যে কেবল গলায় একটা সাদা পৈতে ঝুলিয়ে দুটো অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণ করবে আর আমরা দলে দলে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে পায়ের ধূলো মাথায় দেব—সে যুগ—সে দিন আর নেই। তোমার অতীতের কোন ঘটনা আমরা জানিনে—চুরি করে এসেছো কি ডাকাতি করে এসেছো, লেখাপড়া জানো কি না—সে সব আমার অজ্ঞাত। সে সব প্রমাণ নিয়ে এসো, আমাকে দেখাও, তোমার পৈত্রিক কাজ তুমিই পাবে। আজ তুমি যাও, কাল একবার এসো, দেখা যাবে।"

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার আস্তে আস্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা ইহারই মধ্যে শুভ্র আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। দূরে কোথাও একটা পাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে—চোখ গেল—চোখ গেল।

জয়ন্ত রোষে ক্ষোভে ফুলিতেছিল, বলিল—"ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি জানেন না—এখানে আমার থাকার জায়গা নেই।"

ভবেশ চৌধুরী চলিতে চলিতে থামিলেন, "ও, আমারই ভুল হয়েছে। আমার এ বাড়ীতে উপস্থিত একেবারেই স্থানাভাব, আমার নায়েবের

বাড়ী তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—আমার সঙ্গে এসো। তিনি ব্রাহ্মণ, তোমার বাপের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তাঁর বাড়ীতে থাকতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।"

দ্বারোয়ানকে দিয়া তিনি জয়ন্তকে নায়েব যদুপতি চক্রবর্ত্তীর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

৭

বাড়ীতে সেদিন মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মিলার কয়েকজন পরিচিত বন্ধু আসিয়াছে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পল্লীগ্রাম মোটে দেখে নাই। অসিত মিত্র সাহিত্যিক, সম্প্রতি পল্লী সম্বন্ধে একখানা বই লিখিতে সুরু করিয়াছে কাজেই পল্লী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা দরকার, সে সেইজন্য আসিয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে সে গ্রামখানা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে তাহার নাকি অনেক কিছু জানা হইয়া গেছে।

অসিতের সহিত আসিয়াছে রমেন্দ্র শ্রীপতি ও রবি, ইহারা শিকার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামে আসিয়াছে। সাহিত্যিক অসিত তাহাদের বুঝাইয়াছে. গ্রামের দিকে বড় বড় বাঘ ভালুক পাওয়া যায়, অন্ততঃ পক্ষে শৃগাল ও পাখীও মিলিবে।

ইহাদেরই সঙ্গে আসিয়াছে অসিতের ভাগিনী চন্দ্রা, মিলার বান্ধবী কৃষ্ণা—।

সন্ধ্যায় বড় হলটায় চায়ের আসর বসিয়াছিল।

বন্দুক লইয়া রমেন্দ্র ও শ্রীপতি বেলা তিনটার সময় শিকার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এইমাত্র ফিরিয়াছে, শিকার কিছুই মেলে নাই। রবিকেও

তাহারা দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দুপুরে রৌদ্রে সে বাহির হইতে চায় নাই।

অসিত ঘন্টা দুই গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—এতক্ষণ সে ছাদের এক কোণে বসিয়া তাহার বইখানার একটা চ্যাপটার শেষ করিয়া আসিয়াছে।

মিলা সকলকে চা পরিবেশন করিতেছিল—চন্দ্রা এককোণে অবস্থিত পিয়নোটার উপর আঙ্গুল বুলাইতেছিল, কৃষ্ণা ততক্ষণ রবির সহিত তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিল। ভবেশ চৌধুরী এতক্ষণ বাহিরে ছিলেন, তিনি এই সময় প্রবেশ করিলেন।

সহাস্যে বলিলেন, তোমাদের পার্টিটা বড় বেশী রকম জমে উঠেছে দেখে আমি আর দূরে থাকতে পারলুম না, আশা করছি আমি আসায় তোমাদের খুব বেশী ক্ষতি হয় নি।

মিলা এক কাপ চা ঢালিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "মোটেই না—বরং লাভই হল যে আমরা আমাদের মধ্যে আপনাকে পেলুম বাবা।"

বেচারা রমেন ও শ্রীপতি বিমর্ষভাবে একপাশে বসিয়াছিল—রমেন বলিতেছিল—"আর এখানে ভালো লাগছে না—পাড়াগাঁগুলো বেজায় একঘেয়ে ধরণের ;—না আছে লোকজন, আমোদ-প্রমোদ, না আছে শিকার—না আছে কিছু, এখানে নাকি মানুষ থাকতে পারে। মিস চৌধুরী যে কি করে এখানে রয়েছেন, কলকাতা—বিশেষ বালিগঞ্জের মত জায়গা ছেড়ে আমি তাই ভাবছি!"

মিলা একটু হাসিল, বলিল, "দু-একদিন বড় খারাপ লাগে, তারপর অবশ্য নেহাৎ মন্দ লাগে না।"

রবি বলিল, "বাংলা অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষের গ্রামগুলো সবই এক টাইপের, এমন নোংরা যে দেখলে আর চাইতে ইচ্ছে করে না। গ্রামের লোকগুলো না জানে সভ্যতা, না জানে শিক্ষা, কোন রকমে দিন কাটিয়ে যাওয়াটাকেই এরা মানুষ জন্মের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তুমি গ্রামে যাওনি মিলা, গেলে দেখতে পেতে আমার কথা সত্য কি না।

মিলা বলিল, "যাওয়ার ইচ্ছা আমার প্রথমে যে ছিল না তা বললে ভুল হবে। কিন্তু এখানে আজ কয়দিন এসে বাইরে থেকেই এদের যা পরিচয় পেয়েছি তাতে গ্রামের মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে আমার মিলিয়ে গেছে। বাবা সেদিন আমায় নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছিলেন, পথ দিয়ে যেতে যে সব নোংরামী চোখে পড়লো—"মেয়েরা এমন ভাবেও থাকে—"

ভবেশ চৌধুরী বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি নোংরামী মনে কর মিলু— ওদের কাছে এই যথেষ্ট। গ্রামের যাদের একটু অবস্থা ভালো, শিক্ষা যারা পায়, তারা গ্রামে আর থাকতে চায় না, সহরে চলে যায়। গ্রামে যারা পড়ে থাকে সত্যই তারা দরিদ্র, শিক্ষা তারা পায় না সেই জন্যেই তাদের বাধ্য হয়ে এখানে পড়ে থাকতে হয়, কোন রকমে অতি সংক্ষেপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়। মেয়েরা ছেঁড়া কাপড় কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে পরে লজ্জা নিবারণ করে, ছোট ছেলে মেয়েরা কাপড় জামা পায় না। এরজন্যে তোমার লজ্জা আসতে পারে, তাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ তারা দেখতে পায় না।"

মিলা বিস্মিত নেত্রে পিতার পানে তাকাইল।

বাস্তবিক ভবেশ চৌধুরীর মুখে এ ধরণের কথা শুনিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। একমাস আগে যে কেহ ভবেশ চৌধুরীকে দেখিয়াছে

তাহারা আজ তাঁহার মুখে এ ধরণের কথা শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে।

রবি মিলার পক্ষাবলম্বন করিল, বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় এরা ইচ্ছা করলে অনেক উন্নত হতে পারে, ওরা ইচ্ছা করেই এমনি অবস্থায় পড়ে থাকে। নোংরামী যাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে তাদের কাছে শিক্ষা সভ্যতার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে তারা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে। মনে করুন—একজন চাষাকে যদি আপনি বলেন পৃথিবী ঘুরচে, সূর্য্য স্থির হয়ে রয়েছে, সে নিশ্চয়ই আপনাকে পাগল বলবে।"

মিলা বলিল, "বাবা অনেককাল পরে গ্রামে এসে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন কি না—নইলে এ জায়গাই ওঁর এত ভালো লাগে। দেখবার জন্যে আসা—সে দেখা দু-দিনেই হয়ে গেছে, এখন ফিরে গেলেই হয়। আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না বাবা, এঁরা যখন যাবেন, আমি কিন্তু এঁদের সঙ্গেই চলে যাব।"

পিতা কেবল নিরুপায়ের হাসি হাসেন,—মাথায় হাত বুলান।

মিলা রাগ করিয়া বলিয়া চলিল, "সত্যি—বাবার যে কি ভালো লেগেছে এই গ্রাম তা জানিনে। এই জঙ্গল, একটা লোক সভ্য শিক্ষিত নেই,—বন্যপশুর মত যারা জীবন যাপন করে, ওদের সঙ্গে আমার কথা বলবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় না—"

ভবেশ চৌধুরী অত্যন্ত হালকাভাবে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "ওদের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি মিলু, তবু এই দেশের উপর আমার যে একটু মায়া আছে এ কথা তোমায় বলে রাখছি। আমার এ দুর্ব্বলতা নিয়ে তোমরা আমায় দু-কথা বলতেও পারো, তাতে অবশ্য আমি আপত্তি করব না।"

তিনি চুপ করিয়া গেলেন,—

ইহার পর আসর আর তেমন জমিল না,—সাহিত্যিক অসিত তাহার বই লিখিবার জন্ম পাশের ঘরে চলিয়া গেল, ক্লান্ত শ্রীপতি ও রমেন খানিকটা বিশ্রাম লইতে গেল।

জ্যোৎস্নালোকিত বাগানে বেড়াইবার আগ্রহে কৃষ্ণা ঘরের বাহির হইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল—সে রবিকে সম্মত করাইয়া মিলাকে ডাকিল,—

মিলা মাথা নাড়িল—তাহার শরীর ও মন ভালো নাই, সে বাগানে যাইবে না। রবিও যাইতে আপত্তি তুলিয়াছিল, মিলা তাহাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিল।—

বারাণ্ডার অর্দ্ধেকটা শুভ্র জ্যোৎস্নায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল মিলা রেলিংয়ে ভর দিয়া আকাশের পানে চাহিল। শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে। পরিষ্কার আকাশের বুকে এখানে সেখানে দুই একটী নক্ষত্র ফুটিয়াছে। আকাশের বুকে নামিয়াছে আলোর বন্যা তাহারই প্লাবন নামিয়া আসিয়াছে ধরিত্রীর বুকের উপর—মাটীতে ফুটিয়াছে ফুল, সবুজ কচি পাতা জাগিয়াছে। নিকটেই মুকুলিত আমগাছে বসন্তের বাতাসের দোলা লাগিয়া মকুট মুকুলের সুমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বাগানের একপাশে প্রকাণ্ড বড় দীঘির জলে ছোট ছোট তরঙ্গের মাথায় চাঁদের শুভ্র আলো পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিয়া জলিতেছে—।

মিলা মুগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া রহিল, মুহূর্ত্তের জন্ম সে পিতার কথা—আর সব কথা ভুলিয়া গেল।—

এই শান্ত রাতের বুকে কোথা হইতে অতি মিষ্ট বাঁশীর সুর ভাসিয়া

আসিতেছিল—অতি সাধারণ গ্রাম্যসুর, কোথায় কোন্ পর্ণকুটিরে বাঁশী বাজিতেছে কে জানে।

মিলা সহরে অনেক স্থানে বিখ্যাতবাদকের ক্ল্যারিয়োনেট শুনিয়াছে,—আজ তাহার মনে হইল তুচ্ছ বাঁশের বাঁশীতে যে সুর বাহির হয়, এমন সুর সত্যই বিখ্যাত বাদকের মূল্যবান বাঁশীতে কোনদিন ফুটিতে সে শুনে নাই।—

"মিলা—মিল—"

পিছনে পিতার আহ্বান শুনিয়া মিলা ফিরিল—পিতা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

মিলা উত্তর দিল, "কি বাবা—?"

ভবেশ চৌধুরী রেলিংয়ের কাছে সরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে মা,—নির্জনে বলতে চাই, অত লোকের মধ্যে বলা সম্ভব নয় বলেই বলিনি, এখানে তুমি একা আছ সেই জন্যই বলতে চাই।"

পিতা তাহাকে কোনদিন এমনভাবে কোন কথা বলিতে চাহিবেন তাহা মিলার ধারণারও অতীত, সে তাই বিস্ময়ে দুইটি চোখ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ভবেশ চৌধুরী শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "একটা কথা শুধু শুনে রাখো মিল, আমি সত্যই বদলে যাচ্ছি,—এই বাড়ীতে বহুকাল পরে আমি এসেছি,—আজ আমার মনে হচ্ছে—আমার বর্ত্তমান জীবনটাকে বাদ দিয়ে সেই আগের শিশু জীবনটাকে যদি পেতুম। এই ভিটেকে একদিন তাচ্ছিল্য করেছি, এর পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র স্মৃতি অপমানিত করেছি, আজ সে সব কথা মনে করতে আমি নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি।"

মিলা বুঝিল পিতার অন্তরের কোন গোপন তারে আজ আঘাত

লাগিয়াছে, যাহার জন্ম তিনি—সেই কঠিন প্রকৃতি লোকটী আজ একেবারে বদলাইয়া গেছেন। পিতাকে কোনদিন সে নাগালের মধ্যে পায় নাই, বরাবর তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার হঠাৎ এ ভাবান্তরের অর্থ কি?

সে বলিল, "আপনার শরীর আজ নিশ্চয়ই খারাপ বাবা, আপনি সকাল সকাল শুয়ে পড়বেন চলুন। আমি বরং আপনার কাছে গিয়ে বসছি, আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসব।"

"ঘুম পাড়িয়ে—"

পিতা হাসিলেন,—"আমায় আবার ঘুম পাড়াবি কি? আমি বলছি আমার শরীর বা মন কিছুই খারাপ হয়নি, রীতিমত সুস্থ আছে। তবু আজ কয়েকটা কথা মনে পড়লো কিনা মিল—"

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আজ ভেতরকার একটা ঘরে গিয়ে তোমার মায়ের হাতের বহুকাল আগেকার একটা চিহ্ন দেখলুম,—তাঁর পূজার উপকরণ,—তোমার মা অতি সাবধানে যা রক্ষা করেছিলেন। সেইগুলোর পানে চেয়ে আমি সত্যই নিজেকে সামলাতে পারিনি মিল—"

তিনি নীরব হইয়া গেলেন।

মিলা বলিল, "অতীতে যা গত হয়েছে তা নিয়ে অভিভূত হয়ে দিন কাটানো আপনার মত কর্ম্মবীরের মানায় না বাবা।"

ভবেশ চৌধুরী শুষ্ক হাসিলেন, বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছো মিলা—অতীত নিয়ে থাকা আমার পোষাবে না, কাজকেই সকলের উপরে জায়গা দিতে হবে। এই যে আমি, আজ ক্ষণিকের জন্ম ভুলে যাচ্ছি আমার মাথায় অতবড় কর্ত্তব্যের বোঝা চাপানো কলকাতায় গিয়েই এ সব কথা ভুলে যেতে হবে,—তবু—তবু—"

হঠাৎ থামিয়া গিয়া চিন্তিত মুখে তিনি বলিলেন,—"থাক, আমি শুতে চলছি মিল, আমি কিছু খাবনা বলে দিও—"

তিনি যেমন আসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে চলিয়া গেলেন, মিলা নিঃশব্দে কেবল চাহিয়া রহিল, আজ পিতাকে কেমন যেন হেঁয়ালী মনে হইতেছিল।

৮

ভোরের আলো ধরণীর মুখে প্রথম পরশ বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—।

যদুনাথের বাড়ীতে কাল রাত্রে সে স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ যদুনাথ জয়ন্তকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়াছেন। মাসিক আট টাকা বেতনের দরিদ্র গোমস্তার পর্ণ-কুটীরে পোলাও কালিয়া না জুটুক, ডাল ভাত জুটিয়াছিল।

অতিথির সম্মুখে মোটা লাল চালের ভাত ধরিয়া দিতে যদুনাথের স্ত্রী ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন—উপকরণও সামান্য ডাল ও মাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

কিন্তু এই আহার্য্যের মধ্যে জয়ন্ত যে আন্তরিক স্নেহ পাইয়াছিল, এই পর্ণ-কুটীরের বারাণ্ডায় একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়া সে যে শান্তি পাইয়াছিল এমন স্নেহ শান্তি ধনীর প্রাসাদে মিলে না। সকলের মূলে এখানে আছে আন্তরিকতা,—এবং তাহাই আনিয়াছে স্নেহ যত্ন ও ভালোবাসা,—ধনীর প্রাসাদে ইহা পাওয়া সম্ভব নয়।

একখানি মাত্র ঘর, উঠানের একপাশে একটা লম্বা চালা কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার একদিকে হয় রন্ধন, একদিকে থাকে

কয়েকটী গরু, একপাশে একটী ঢেঁকিঘর আছে—ধানের গোলাও আছে।

প্রাচুর্য্য না থাক, মোটামুটি দিন কাটিয়া যায়, আহার্য্যের জন্য কাহারও গলগ্রহ হইবার সম্ভাবনা কম। জয়ন্ত দেখিল ঘরের পিছনে খানিকটা বাগানও আছে, তাহাতে কিছু তরকারীও লাগান হইয়াছে।

গ্রামে যত সহজে যত স্বচ্ছন্দে দিন চলে, কলিকাতার মত জনাকীর্ণ সহরে তেমন চলে না। পরের ঘরে মাসিক টাকার বিনিময়ে মাথা গুঁজিয়া কোন রকমে দিন চালানো চলে, স্বাধীনতা তাহাতে একটুকু নাই। কয়েক-মাস ভাড়া না দিতে পারিলে নোটিশ আসিবে মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকু ত্যাগ করিয়া পথ ছাড়া দাঁড়াইবার স্থান মিলে না। সে পথও নিরাপদ নয়—তাহাতেও দাঁড়াইয়া বসিয়া কৈফিয়ৎ—মানুষ হয়রাণ হইয়া পড়ে।

এই যে এতটুকু একখানা ঘর—খড়ের চাল, বেড়ার দেওয়াল, তবু ইহাতে বাস করিয়াও আছে স্বাধীনতা—এই খড়ের ঘরে বাস করিয়াও ইহার অধিবাসীরা ফেলে শান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস।

জয়ন্ত বেড়ার দরজা খুলিয়া বাহির হইল।

পূর্ব্বদিক লাল করিয়া প্রকাণ্ড বড় সূর্য্য উঠিতেছে, আকাশের এমন সৌন্দর্য্য জয়ন্ত ছবিতে দেখিয়াছে, সে কৃত্রিম মাত্র, প্রকৃত রূপের বিকাশ সে দেখে নাই। মুগ্ধনেত্রে সে খানিক পূর্ব্বাকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

এই তাহার জন্মভূমি,—কেবল তাহার নয়—তাহার পিতার,—তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি। পিতা ছাড়া পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে এই গ্রামের বুকে দেহ রক্ষা করিয়াছেন,—নিজের ভিটায় দেহত্যাগ করিবেন এ কল্পনাও ছিল তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। কেবল তাহার

হতভাগ্য পিতাই ব্যতিক্রমের পথে গিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষের ভিটায় তিনি দেহত্যাগ করিবার অধিকার পান নাই।—

পথ চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক জয়ন্ত কতদূর আসিয়া পড়িয়াছে সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িয়া গেল—সে যদুনাথের অতিথি, তিনি হয়ত তাহাকে দেখিতে না পাইয়া খোঁজ করিতেছেন।

পথ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া জয়ন্ত দাঁড়াইল, আন্দাজে একটা পথ ঠিক করিয়া লইয়া সে অগ্রসর হইল।

সহরের মত পল্লীর বুকে কর্ম্মব্যস্ততা নাই,—এখনও অনেক বাড়ীতে অনেকের ঘুম ভাঙ্গে নাই। গৃহস্থ-বধূ কোন বাড়ীতে উঠান পরিষ্কার করিতেছে, দুই একখানা গৃহস্থ বাড়ী হইতে ধান ভাঙ্গা ঢেঁকির দুপদাপ শব্দ কাণে আসিতেছে।

চলিতে চলিতে জয়ন্ত একটী মেয়েকে দেখিতে পাইল, একটী গরুর দড়ি ধরিয়া সে মিথ্যা টানাটানি করিতেছে, কিন্তু গরু এই ক্ষুদ্র মনিবের টানা হেঁচড়ায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখাইয়া ধীর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা কোথায় বলতে পারো খুকি ?"

স্বেদাক্ত ললাট অঞ্চলে মুছিয়া মেয়েটী পিছন ফিরিয়াই উত্তর দিল—"জানি নে—" কণ্ঠ তাহার বিরক্তিতে ভরা,—সকালবেলাই গরুটা তাহাকে বেজায় কষ্ট দিতেছে।

জয়ন্ত খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল,—

কতই বা বয়স, বারো কি তের বৎসর যদি হয়। শাড়িখানা বেশ

পরিপাটিরূপে সে পরিয়াছে—সহরের ফ্রকপড়া মেয়েদের মত সে শাড়িকে ত্যাগ করে নাই। জয়ন্ত কাল রাত্রেই শুনিয়াছে এখানে মেয়ে একটু বড় হইলেই তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। এ মেয়েটী বিবাহিতা কি না দেখিবার অদম্য কৌতূহল লইয়া জয়ন্ত সম্মুখের দিকে আসিল।

সিঁথায় সিন্দুর প্রমাণ দিল তাহার বিবাহ হইয়া গেছে। বিবাহিতার গৌরব সে অর্জ্জন করিয়াছে কাজেই খুকি বলিয়া সম্বোধন করিলে রাগ হওয়ারই কথা।

টানাটানি করিয়া গরুটাকে সরাইতে পারা গেল না, নেহাৎ অনর্থক মেয়েটীকে হাঁপাইয়া পড়িতে হইল। যত রাগ গিয়া পড়িল এই লোকটার উপরে, মেয়েটী চোখ তুলিয়া জয়ন্তের পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায় খুকি—?"

আবার খুকি—

মেয়েটী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"জানি নে—" সঙ্গে সঙ্গে সে নিমিষে উধাও হইয়া গেল। অদূরে যে ছেলেটী একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া নির্জনে এই সকালবেলায় আখ চিবাইতেছিল, মেয়েটীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে বাহির হইয়া আসিল।

খানিকটা আখের টুকরা মুখের মধ্যে লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "ওঃ, আপনি আর লোক পেলেন না কথা জিজ্ঞেস করবার তাই ওই রমাটার সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। ওর মত দুষ্টু মেয়ে আমাদের দেশে আর নেই—তাই ওর সঙ্গে আমি মোটে কথা বলিনে। কি জানতে চান বলুন—আমি আপনাকে বলছি।"

এই সকালবেলা এত গোপনে তাহাকে আখ চিবাইতে দেখিয়া বু

গেল এটি সে বৈধ উপায়ে হস্তগত করে নাই—সেজন্যই তাহার সাবধানতা এত বেশী। বয়স বারো তেরই হইবে,—রমা মেয়েটীর সমবয়সী। কথা শুনিয়া বেশ বুঝা যায়—মেয়েটীকে সে মোটেই পছন্দ করে না।

জয়ন্ত তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া বুঝিল—এই ছেলেটির দ্বারাই তাহার কাজ চলিবে। বলিল, "আমি যদুনাথ চক্রবর্তীর বাড়ী যাব, কোন্ পথে গেলে যেতে পারব বলতে পারো খোকা—?"

ছেলেটী গম্ভীর মুখে বলিল' "আমার নাম খোকা নয়—মণ্টু। যদুনাথ চক্রবর্তীর বাড়ী ওই ও পাড়ার বাগ্দীপাড়াটা পার হয়ে কায়েতপাড়া, তারপরে বামুনপাড়া। নাক বরাবর চলে যান—সোজা পৌছে যাবেন, কিছু ভাবতে হবে না।"

জয়ন্ত নিজের উপর নির্ভর করাই সমীচিন মনে করিল তথাপি মণ্টুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায় মণ্টু,—চলনা তোমাদের বাড়ীটা একটু দেখে আসি।"

মণ্টু এইবার এই লোকটীকে সন্দেহ করিল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জয়ন্তের আপাদ-মস্তক বুলাইয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি বাড়ী নিয়ে যাই আর আপনি দাদাকে বলে দিন—আমি কেষ্টদাসের ক্ষেত হতে আখ চুরি করেছি।"

এত সকালে আখ পাওয়া এবং ভক্ষণ করার তথ্য পাওয়া গেল, এবং এই তথ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে এক বন্ধুকে দেখিয়া মণ্টু বিদায় লইল।

সূর্য্য তখন আকাশপথে খানিকদূর উঠিয়া আসিয়াছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসিতেছে; জয়ন্ত যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিল।

পথেই দেখা হইল যদুনাথের সহিত—

"এই যে বাবাজি, আমি তোমাকেই খুঁজতে বার হয়েছি। সকাল-বেলা উঠে দেখি তোমার বিছানা পড়ে রয়েছে, তোমার চিহ্নমাত্র নেই; বাধ্য হয়ে বার হয়েছি;—কোথায় গেলে একটা খোঁজ তো নিতে হবে।"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই—হারাব না। কলকাতা হতে এতদূর যখন এসে পৌঁচেছি,—থাকার জায়গা পেয়েছি, পাড়াগাঁয়ের পথে হারাব না—যেমন করেই হোক গিয়ে পৌঁছাব। আপনি আবার খুঁজতে বার হয়েছেন তার জন্যে আমি লজ্জা পাচ্ছি।"

যদুনাথ তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, "এতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই বাবাজি—তুমি আমাদের দীনুর ছেলে, সে আমায় চিরকাল দাদা বলে ডেকেছে, বড় ভাইয়ের মতই মানতো। তার ছেলে তুমি আমার কাছে এসেছো—কোথায় গেলে সেটা খোঁজ নেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয়?"

তিনি অগ্রসর হইলেন—জয়ন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পথের পাশে একটা উঁচু ঢিবি দেখাইয়া যদুনাথ বলিলেন—"একদিন এইখানে তোমাদের ভিটে ছিল বাবাজি, আজ সব সমভূমি হয়ে গেছে। কেউ দেখে বলতে পারবে না একুশ বাইশ বছর আগে এখানে একটী পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতো।"

পিতৃপুরুষের ভিটা—

জয়ন্ত পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল।

এখানকার মাটি কত পবিত্র—এই তাহার পুণ্যতীর্থ। এইখানে বাস করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ—তাহার পিতা ও মাতা, জয়ন্তের জীবনের প্রথম তিন বৎসর এখানে কাটিয়াছে, এইখানে সে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখিয়াছে, এই মাটির বুকে সে স্থান পাইয়াছে।

জঙ্গলে চারিদিক ভরিয়া গেছে। আকন্দফুলের গাছগুলি শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র ফুলে তাহাদের মাথা নুইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় গাছগুলা আগাছার ঝোপে ঢাকিয়া গিয়াছে, কয়েকটা গাছের পাতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দূর হইতে জানা যায় না।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল—দুই হাত যোড় করিয়া সে কপালে রাখিল।

৯

ভবেশ চৌধুরী খবর পাঠাইয়াছেন—

জয়ন্তকে এখনি তিনি কাজ দিতে পারেন না বর্ত্তমান পুরোহিত হেম ভট্টাচার্য্য মন্দিরের কাজ নাকি একান্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন, বিনাদোষে তাঁহাকে জবাব দেওয়া চলে না।

বিনাদোষে জবাব —

জয়ন্তের বুকের মধ্যে গরম রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। আজ হেম ভট্টাচার্যকে বিনাদোষে তাড়ানোর প্রস্তাবে ভবেশ চৌধুরীর বিবেক জাগিয়াছে—তবু হেম ভট্টাচার্য্য এখানকার লোক নহেন, ভাটপাড়া তাঁহার জন্মস্থান—সেখানে তাঁহার বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজন সবই আছে। আর হতভাগ্য দীনু ভট্টাচার্য্য, দুনিয়ায় যাহার স্থান ছিল না, আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না, তাহাকে তিনি এক কথায় জবাব দিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার বিবেকে এতটুকু বাধে নাই, একটীবারের জন্য তিনি ভাবেন নাই এই হতভাগ্য লোকটী স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া কোথায় যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে, কে তাহাদের ভার লইবে।

পিতার কথা আজ জয়ন্তের মনে পড়ে না—মায়ের দুঃখ কষ্টের অবস্থা

সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। অক্ষম ছেলে সে,—মা প্রতিদিন কি কষ্টেই না এই অক্ষম ছেলের ভরণ পোষণ চালাইয়াছেন, তবু একটা দিনের জন্য তাঁহার মুখের হাসি মিলায় নাই।

কলিকাতার বাসার কাছে এক দেব-মন্দিরে দুইবেলা তিনি পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন, মাস গেলে এখান হইতে দশটা করিয়া টাকা পাওয়া যাইত, চাল ফলমূল প্রত্যহ কিছু করিয়া মিলিত। সেই মা—যাঁহার মুখ কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, তাঁহাকে এইভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে হইয়াছে—সে কি এই জমিদারের খেয়ালের বশে নয়?

জয়ন্তের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রক্তস্রোত সজোরে প্রবাহিত হয়।

যদুনাথ কাজে চলিয়া গিয়াছিলেন, বেলা প্রায় দুইটার সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিলেন, কাজের জন্য প্রায় প্রত্যহই তাঁহার বিলম্ব হয়। আজকাল পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে—সাল তামামীর সময় আসিয়া পড়িয়াছে, ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজের বিরাম নাই। আজও যদুনাথ সেই ভোরবেলা বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিলেন এখন—আবার তিনটার সময় বাহির হইতে হইবে; "কত রাত হইবে" কে জানে; কাল ফিরিয়াছিলেন অনেক রাত্রিতে, আজও হয়তো রাত অনেক হইবে।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেন;—শুইয়া পড়িলেন, জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এত খাটনীতে আর দিন চলেনা বাবাজি,—জবাব দিয়েছিলুম আবার অন্ততঃপক্ষে এই দুই মাসের জন্যেও টিঁকে থাকতে হল।"

কথাটা যে ঠিক নয় তাহা জয়ন্ত ইহারই মধ্যে জানিয়া ফেলিয়াছে; বিশ্রামলাভ সকলের পক্ষে অসহ্য শাস্তি বলিয়াই মনে হয়,—কাজের নেশা

এমন ভাবে পাইয়া বসে তখন বিশ্রাম করা চরম শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

এই যে মানুষটি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন—এ পরিশ্রম না করিলেও চলিত। একটী মাত্র কন্যা, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য ভাবিবার কোন কারণ নাই—দুইটী মানুষের দিন বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইবে।

জয়ন্ত বলিল, "এ দুই মাসের জন্যে থাকতে হল কেন, আপনি না করলেও চলতো।"

তামাক টানিতে টানিতে যদুনাথ বলিলেন, "তা আর চললো কই? জমিদার এসেই ডেকে পাঠালেন—বললেন তাঁর এ বছরের কাজ আমায় করে দিতেই হবে নইলে আমার মুক্তি নেই। কি করি পুরাণো মনিব, কাজ আবার নিতেই হল।"

জয়ন্ত চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। পল্লীর পরিচয় সে এখনও পায় নাই, পাইলে হয়তো যদুনাথের স্বরূপ বিকাশ দেখিয়া সে চমকাইয়া যাইত।

যদুনাথ বলিলেন, "জমিদার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শুনলুম, তুমি নাকি যাওনি—"

জয়ন্ত ছোট করিয়া উত্তর দিল—"না, দরকার হয়নি।"

যদুনাথ গলার সুর নামাইয়া বলিলেন, "বাবাজি, বুড়োর কথা শোন, জমিদারের কথা, তাতে তোমার ভালোই হবে। হয়তো তিনি তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে তোমার কাজের ব্যবস্থাটা ঠিক করে ফেলবেন—তাঁকে চটিয়ে দিলে কাজটা যে ভাল করবে না তা জানা কথা।"

ঘৃণাপূর্ণ-কণ্ঠে জয়ন্ত বলিল, "ভালো না হলেও আমার বিশেষ কিছু

আসবে যাবে না চক্রবর্ত্তী মশাই, আমি যেমন এসেছি তেমনি চলে যাব এইমাত্র হবে। তা বলে আমার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে নিতে তাঁর কাছে গিয়ে যে আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আসল কথা—আমি আমার কাজ পেতে চাই, খোসামোদ করে নয়—আমার প্রাপ্য দাবীর সূত্রে।"

যদুনাথ বলিলেন, "খোসামোদ করার কথা তো হচ্ছে না বাজি, তিনি যদি কথা বলতে চান, যদি কিছু জানতে চান—"

জয়ন্ত বলিল, "দরকার যখন পড়বে সে পরিচয় দেব, আগে দিতে যাব না।"

যদুনাথ আর কথা না বলিয়া চোখ বুজিলেন, ইহার পর জয়ন্ত কি বলিল না বলিল সেদিকে তাঁহার কাণ গেল না।

একটু তন্দ্রা উপভোগ করিয়া যদুনাথ কাছারী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে বলিলেন, "তাহলে আমি গিয়ে ঐ কথাই বলি, তিনি আবার আমাকে জানাবার ভার দিয়েছেন কিনা—"

"হ্যাঁ, তাই জানাবেন—"

বলিয়া জয়ন্ত উঠিল,—

যদুনাথের মুখে আজ সকালেই সে জমিদারের বিরুদ্ধে কথা শুনিয়া লোকটী যে মোটেই সহজ সরল নহেন এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বার বা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে আবার তাঁহাকে জমিদারের স্বপক্ষে টানিয়া কথা বলিতে শুনিয়া জয়ন্ত সত্যই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল

এটুকু সে বেশ বুঝিল—ইহার পর আর এখানে থাকা তাহার প সম্ভব হইবে না। সে নিজের অধিকার দখল করিতে আসিয়াছে—করুণা-ভিক্ষা করিতে আসে নাই কাজেই সে মাথা নত করিতে রাজি নয়।

তাহা ছাড়া—ভবেশ চৌধুরীর মত লোক হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কি বুঝিবেন যে তাহাকে পরীক্ষা করিতে চান?

লোকটিকে দেখিয়া জয়ন্তের মনে এতটুকু শ্রদ্ধা জাগে নাই। যে নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয়, পরের আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়, নিজের দেশের খবর রাখে না, তাহাকে জয়ন্ত শ্রদ্ধা করিতে পারে না। দেশের জমিদার হইয়াও যে দেশের প্রজাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে কোনদিন চায় নাই,—বৎসর বৎসর ম্যানেজারের দ্বারা খাজনা আদায় করিয়া—প্রজাদের বুকের রক্ত সেই টাকায় সহরে থাকিয়া বিলাসীতায় দিন কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে জয়ন্ত সহ্য করিতে পারে না।

দুইদিন থাকিতে থাকিতে সে লোকের মুখে জমিদারের পরিচয় পাইল। মন্দিরের পূজার প্রকৃত অধিকারী আসিয়াছে, গ্রামের লোক তাহাকে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকেই জয়ন্তকে নিজের বাড়ীতে রাখিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইল, কিন্তু সে যদুনাথের বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

যদুনাথকে সে পছন্দ করিতে পারে নাই, দুদিনেই সে তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল। আড়ালে যে জমিদারের নিন্দাকীর্ত্তনে তিনি পঞ্চমুখ হন—প্রকাশ্যে তাহাকেই যে কতখানি তোষামোদ করিয়া চলেন তাহার প্রমাণও জয়ন্ত পাইয়াছে।

এ রকম লোকদের জয়ন্ত দেখিতে পারে না। মানুষ মনে এক ভাব রাখিয়া মুখে অন্য ভাব দেখায় জয়ন্ত সে পরিচয় তাহার এতখানি বয়সের মধ্যে পায় নাই। পড়াশুনা, জ্ঞানালোচনার মধ্যে তাহার দিন কাটিয়াছে, দুনিয়ার পরিচয় সে পায় নাই বলিয়াই বিস্মিত হইতেছিল—স্তম্ভিত হইতেছিল।—

যতুনাথের স্ত্রী সুদর্শন এই ছেলেটাকে সত্যই স্নেহের চোখে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার যত্ন ও স্নেহই জয়ন্তকে ধরিয়া রাখিল।

১০

একা জয়ন্ত মাটির স্তূপের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

এই তাহার পূর্ব্বপুরুষের ভিটা—।

মায়ের বাক্সের মধ্যে সে তাহাদের বংশ তালিকা দেখিয়াছিল,—তাহাতে জানিয়াছিল তাহারা বহুকাল হইতে এই গ্রামে বাস করিয়া আসিয়াছেন। এই ভিটা ছিল তাঁহাদের বাস্তুভিটা, কেহ কখনও এ ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই।

সামনের ওই আমগাছটী—ওটি নাকি জয়ন্তের মা নিজের হাতে রোপণ করিয়াছিলেন। আজ সেই গাছটী মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেদিন যে গাছটী ছিল, এতটুকু শিশু—আজ সে প্রকাণ্ড বড় একটী গাছ, কত লোককে ফলদানে তৃপ্ত করে,—কত লোককে ছায়াদান করে।

মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া কাঁপিতেছিল, স্ফুট মুকুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধের সহিত মিশিয়া অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অদূরে গোলমাল শুনা যাইতেছিল—কে যেন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে—"দোহাই হুজুর—আর মারবেন না, মরে যাবে, ঢের হয়েছে হুজুর—" সঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল—"মারব না—চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব, বেটা ছোটলোক কোথাকার—"

দরিদ্রের প্রতি ধনীর নির্য্যাতন; হয়তো এতটুকু ত্রুটি ঘটিয়াছে,

তাহার উপযুক্ত পুরস্কার জুটিতেছে বেত্রাঘাত—হয়তো কোন দোষ সে করে নাই—কোন ব্যবহারের মধ্যে এতটুকু ত্রুটি ধরিয়া চলিয়াছে তাহার উপর নির্য্যাতন।

জয়ন্তের বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

পথে দু-চারজন লোক দাঁড়াইয়াছে, জয়ন্তের প্রথম পরিচিত মণ্টু খানিকদূর আগাইয়া গিয়াছিল, জয়ন্তকে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল—"যাবেন না যাবেন না, ওদিকে যাবেন না, ভয়ানক মারামারি বেধেছে—"

বৃদ্ধ সনাতন মৈত্র একটা কড়িবাঁধা থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "কাজ কি ওদিকে গিয়ে, যত রোখ এখনি এই গরীবদের ওপরই এসে পড়বে এখন।"

অদূরে দেখা গেল—তরুণ ম্যানেজার অমূল্য মিত্রকে নিকটে আর যাহারা রহিয়াছে তাহাদের ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ জয়ন্তের ছিল না। অমূল্য মিত্রের বেত আবার উঁচু হইবামাত্র জয়ন্ত তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল—দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হাত নামান—নামান বলছি—"

তাহার কণ্ঠে আদেশের সুর—

অমূল্য মিত্রের হাত আপনিই নামিয়া পড়িল, জয়ন্তের বজ্র মুষ্টিতে তাঁহার হাতে বেশ একটু বেদনা লাগিয়াছিল। হাত নামাইতে জয়ন্ত একটু সরিয়া দাঁড়াইল—

অমূল্য মিত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কিন্তু জয়ন্ত তাহাতে দমিল না। বেচারা শশী বেত্রাঘাতে জর্জ্জর হইয়া ছটফট করিতেছিল, জয়ন্ত তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল, বলিল, "যাও, নিজের কাজে চলে যাও বাপু, অনর্থক এখানে বাবুদের পা ধরে কেঁদে কোন ফল হবে না।"

অমূল্য সগর্জ্জনে বলিল, "তুমি কে হে, আমার কাজে হাত দিতে এসেছো ?—"

জয়ন্ত উত্তর দিল, "আমি যেই হই,—আপনাদের প্রজা নই এ কথাটা জেনে রাখবেন। আপনাদের প্রজা হলে ওদের মত দূর হতে দাঁড়িয়ে দেখতুম, কাছে আসবার সাহস করতুম না। আপনার কাজে হাত দিতে আসা আইনতঃ হয়তো অন্যায় হয়েছে, ধর্ম্মতঃ হয়নি কারণ আপনার অন্যায় অত্যাচার—পীড়ন হতে আমি একটী গরীবকে বাঁচিয়েছি। দরিদ্রকে বাঁচানোর অধিকার পথের লোকেরও আছে,—কাজেই এ সম্বন্ধে আপনার কোন কথা বলা চলে না।"

অমূল্য রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "তুমি যেই হও আমি তোমায় সহজে ছাড়ব না এ কথা মনে রেখো—।"

জয়ন্ত নিজের পেশীবহুল হাত দুখানা আন্দোলন করিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি যা খুসি করবেন, আমি উপস্থিত এখানেই আছি, মনে আশা আছে—আর কিছুদিন থাকবও।" জয়ন্ত শশীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল।

শশীর অপরাধের কাহিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল। জমিদার বাড়ীর ছেলে মেয়েরা টেনিস খেলিবে, সেই জায়গা প্রস্তুত করিবার জন্য শশীর ডাক আসিয়াছিল। শশীর ছেলেটির কঠিন ব্যারাম বলিয়া কাল সে যাইতে পারে নাই। আজ সে ঔষধ আনিতে ডাক্তারখানায় যাইতেছিল, পথেই হইয়াছে ম্যানেজার বাবুর সহিত দেখা এবং তাহার পরই পাইল প্রহার।

শুধু কি এই একজনের উপরেই আজ নূতন করিয়া অত্যাচার হইয়াছে, তাহা নয়। ধনীরা দেশে মহা আরামে বাস করে, প্রাণ যায় এই সব

দীন মজুর কৃষকদের। এমনি উৎপীড়ন কোন না কোন কারণে সবাইকেই সহিতে হয়। এ তবু খুব ছোট একটা ব্যাপার, সময় সময় এই অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে। ঘরে আগুন জ্বালানো, চোখের উপর মেয়েদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ, ধানের গোলা লুট করাইয়া দেওয়া—এ সব জমিদার সরকারের নিত্যকার ঘটনা। কয়েকটা বৎসর পূর্ব্বে কেদার মণ্ডল যে মরিয়া গেল—তাহাতেই বা কার কি হইল। সংসার যেমন চলিবার তেমনি চলিতেছে, সেই ম্যানেজার পেয়াদা হালচাল যেমন ছিল তেমনই আছে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেদার কি করে মরলো?"

শশী আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মার খেয়ে মরলো। কি দোষ করেছিল কে জানে, তাই সেই তিনকেলে বুড়োকে কাছারী বাড়ীতে বন্ধ করে এমন মার ওঁরা দিয়েছিলেন যাতে সেখানেই মারা যায়।"

জয়ন্ত শিহরিয়া উঠিল, "মারা গেল—ওঁরা একটা মানুষ খুন করলে, তাতে কিছু হল না—পুলিস আসে নি?"

শশী বড় দুঃখেই হাসিল, বলিল, "পুলিস বড়লোকের জন্যে বাবু, আমাদের মত গরীবের জন্যে তো নয়। পুলিসও এলো, তদন্তও হল,—কিছুই হল না লাভে হতে পুলিসের কাছে আমরা মিছে কথা বলেছি বলে আমাদেরই নির্য্যাতন সইতে হল। ম্যানেজার বাবু আজ কয় বছর এসেছেন এখানে—এই কয় বছরে দেশের যা দুর্দ্দশা করেছেন—এর আগে এমন হয়নি।"

উৎসুক ভাবে জয়ন্ত বলিল, "ম্যানেজার এমনভাবে অত্যাচার করেন, জমিদার কোন খবর রাখেন না, তিনি কিছু বলেন না?"

বড় দুঃখেই শশী হাসিল, বলিল, "উনি জমিদার বাবুর বন্ধুর ছেলে, আজ বাদে কাল উনিই তো জমিদার হবেন, বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, কাজেই আমাদের কথা জমিদার বাবু কাণে নেন না।"

কথাটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

ম্যানেজার অমূল্য মিত্র জমিদার কন্যার ভাবি স্বামী, ভবেশ চৌধুরী জমিদারী কাজের অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহাকেই দেখাশুনা করিতে রাখিয়াছেন। অমূল্য এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকে এবং সময়ে তাহার অত্যাচার হয় অবর্ণনীয়।

মিলা ও অমূল্য ছোটবেলা হইতে বাগদত্ত, কিন্তু মিলা বি, এ, পাশ করিলে বিবাহ হইবে কথা আছে। এইবার মিলা বি, এ, দিয়াছে, এই বৈশাখে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া ইহাদের বিবাহ হইবে।

জয়ন্ত শশীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল—শশী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন ঠাকুর মশাই ?

জয়ন্ত বলিল, "তোমার ছেলেটীকে একবার দেখে যাই শশী, এতদূর এলুম যখন—একবার দেখে যাওয়া ভালো।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া শশী বলিল, "আপনি বামুন কিন্তু আমরা জাতে বাউরী, আমাদের বাড়ীতে আপনি যাবেন ঠাকুর মশাই, তাতে আপনার জাত যাবে যে—"

জয়ন্ত হাসিল—লোকের ধারণা আজও এরকম আছে। সহরে জাতির পার্থক্য উঠাইবার জন্য চলিয়াছে কত সভা কত সমিতি, কত বক্তৃতা,—কেহ কেহ দল বাঁধিয়া জোর করিয়া অস্পৃশ্যদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পল্লীগ্রাম —যাহার সমষ্টি লইয়া সহর—তথা সমগ্র দেশ সেখানে আজও জাগিয়া

আছে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের মধ্যে এতখানি ব্যবধান,—আজও রহিয়াছে ছোটখাটো লক্ষ ভেদাভেদ। ব্রাহ্মণ—সে যতই অসৎ হোক—তাহার স্থান সকলের আগে, আর অস্পৃশ্য—সে যতই সৎ হোক পবিত্র হোক—তাহাকে থাকিতে হইবে সকলের পিছনে—অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে।

এ দেশের পক্ষে—জাতির পক্ষে দারুণ অভিশাপ। দেশের একটা বিরাট সংঘ বিরাট শক্তিকে অকর্ম্মণ্য নির্জ্জীব করিয়া সমাজের একপাশে আবর্জ্জনার মত এ ভাবে ফেলিয়া রাখার মূলে রহিয়াছে কতখানি স্বার্থ-পরতা, জয়ন্ত তাহাই ভাবে। অথচ ইহারাই দেশের প্রাণশক্তি, ইহারা না হইলে কোন কাজ হইবার যো নাই।

শশী বাউরী খেলার স্থান তৈরী করিয়া দেবে, জঙ্গল পরিষ্কার করিবে, বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেবে,—এক কথায় ত্যক্ত মাটির বুকে সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিবে—তবে যাহারা খেলিতে পারিবে, তাহারাই এতটুকু ত্রুটি দেখিলে চাবুক চালায়—তাহারাই করে পদাঘাত।

১১

বাউরী পাড়ায় প্রবেশ করিয়া জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।—এদিকে সে কোনদিন আসে নাই, সামনের পথ দিয়া চলিয়া যাইতে কুটিরগুলি তাহার চোখে পড়িয়াছে মাত্র।

চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর বাউরী এখানে বাস করে—ইহারা কেহ কেহ মাঠের কাজ করে,—কদাচিত কেহ গাড়ি চালায়,—বেশীর ভাগ লোক পালকী বয়। এ সব অঞ্চলে গরুর গাড়ি ও পালকী বেশীর ভাগ দরকার হয় জমিদার বাড়ীতে, মোটর থাকা সত্ত্বেও দুখানা পালকী আছে। মেয়েরা গৃহের কাজকর্ম্ম করে,—অবসর পেলে ঝুড়ি চুপড়ি, কুলা ডালা

তৈয়ারী করে, পুরুষেরা হাটে বিক্রয় করে। অতি সহজে এবং স্বচ্ছন্দে ইহাদের দিন চলে।

সংসারে শশী বাউরীর তৃতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী আছে, আর আছে প্রথম পক্ষের একটী মাত্র ছেলে রাম বাউরী। জোয়ান ছেলে, জমিদার বাড়ীর কাজ করিত—গত বর্ষা হইতে এবার তাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর ধরিয়া জীর্ণশীর্ণ করিয়া দিয়াছে, ইহার উপর কিছুদিন আগে ম্যানেজার বাবুর পদাঘাতের ফলে সেই যে সে শয্যা লইয়াছে আর উঠিতে পারে নাই।

বৃদ্ধ শশী বাউরীর মাথায় পড়িয়াছে সমস্ত দায়িত্ব, তাহার উপর কাল ডাক্তার বাবু এক রকম প্রায় জবাব দিয়া গিয়াছেন, সেজন্য তাহার মাথার ঠিক নাই, নচেৎ কাজে গাফিলতি সে কোনদিন করে না।

জয়ন্ত বলিল, "ম্যানেজার বাবু তোমাদের এমনি করে মারধর করেন, তোমরা সকলে এক সঙ্গে হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই তো পারো। যদি সকলে দলবদ্ধ হও, নিশ্চয়ই তাঁকে এ রকম অত্যাচার আর করতে হবে না।"

শশী বাউরী নির্ব্বাকে কেবল মাথা নাড়িল—অসহিষ্ণু ভাবে জয়ন্ত বলিল, "তবু চিরদিন তোমরা এই রকম ভাবে লাঞ্ছনা সইবে, তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারবে না?"

শশী বাউরী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কি করে হবে ঠাকুর মশাই, আমরা গরীব লোক, বড় লোকের সঙ্গে লড়বার শক্তি আমাদের নেই। এর ফলে এই হবে—আমাদের ঘর পুড়বে আমাদের যার যেটুকু জমী জমা আছে তাও যাবে, আমরা না খেতে পেয়ে মরব।"

কথাটা ভাবিয়া দেখিলে সত্য। এই সব হতভাগ্য লোক চিরকাল

এমনই নির্য্যাতন সহিয়া আসিতেছে, মুখ ফুটিয়া কোনদিন বাধা দিতে পারে নাই—একটী কথা বলিতে পারে নাই। ইহারা মার খাইতে জানে, ফিরিয়া মারা দূরে থাক—একটী কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। ইহাদের দৈহিক শক্তি হয়তো আছে, নাই সেই বুদ্ধি সেই জ্ঞান—যাহাতে সে শক্তি কাজে নিয়োজিত করা যায়; নাই সেই অর্থ—চলিতে প্রতি পদে যাহার আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী।

জয়ন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

শশী বাউরীর স্ত্রী অবগুণ্ঠন টানিয়া বারাণ্ডায় একটা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া গেল। শশী বাউরী করযোড়ে বলিল, "বসুন ঠাকুর মশাই, গরীবের বাড়ীতে যখন পা দিয়েছেন আপনাকে একটু বসে যেতে হবে।"

এতখানি আন্তরিকতা জয়ন্ত এড়াইতে পারিল না বলিয়াই বসিল, বলিল, "তোমরা এমনি করেই নিজেদের ছোট করে রেখেছো শশী,—"

শশী অবাক হইয়া গেল, কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "কি করে ছোট করেছি ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত বলিল, "কেবল কথায় নয়—কাজেও নিজেদের ছোট করে রেখে। তোমার বাইশ বছরের জোয়ান ছেলেকে যে লোকটা লাথি মেরেছিল সে কিছু ওর চেয়ে শক্তিমান ছিল না। তোমার ছেলে যদি লাথি সইবার জন্যে মাথা নীচু করে না দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতো সেই রোগা লোকটার ক্ষমতা হতো না যে তার গায়ে একটী আঙ্গুল ছোঁয়ায়। আজ তুমি যে এই মারটি খেলে শশী, এ কেবল তোমার মনের শক্তি-হীনতায়—দেহের নয়।"

শশী নিরুপায়ের হাসি হাসিল, বলিল, "আপনি জানেন না ঠাকুর মশাই,—বাধা দিতে গেলে আমাদের অবস্থা হতো কেদার মণ্ডলের মতই।

সেই কাছারী বাড়ীর অন্ধকার ঘরে এতটুকু খাবার—এতটুকু জল না দিয়ে আমাদের শুকিয়ে মারতো। মরে গেলে পুলিসও আসতো—কিন্তু সেদিন যা হয়েছে, আমাদের মরার পরেও ঠিক তাই ঘটতো। যারা দেখবে—তারাও একটী কথা বলবে না, পাছে মনিবের বিষ চোখে পড়ে। আমাদের মত লোকের কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয় ঠাকুর মশাই। ভগবান বিরূপ নইলে—"

"ভগবান—"

বাধা দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে জয়ন্ত বলিল, "না ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না শশী, ভগবানের কোন দোষ নেই। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন—জাতের সৃষ্টি করেন নি, ছোট বড় সৃষ্টি করেন নি,—এ সব সৃষ্টি করেছি আমরাই। তোমরা ছোট—ছোটর দীনতা নিয়ে একপাশে সব ছেড়ে পড়ে আছ, কোন রকমে দিন কাটিয়ে যাও এই মাত্র। নিজেদের নিজেরা না জাগালে আর কেউ জাগাতে পারবে না—"

সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, "আচ্ছা, আজ থাক, কাল একবার সময়মত এসে তোমাদের পাড়াটা বেড়িয়ে যাব—"

সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে ধরণীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরে সে পূজা করিয়াছে, এ বেলাও আরতি করিবে। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারই একান্ত অনুরোধে আজ কয়দিন সে ঠাকুরের পূজারতি করিতেছে।

মন্দিরে প্রবেশ পথে সে বাধা পাইল—ভবেশ চৌধুরী মন্দিরের বারাণ্ডায় একখানা আসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে একটি মেয়ে—না চিনিলেও জয়ন্ত বুঝিল এ তাঁহারই কন্যা মিলা।

সে হাত পা ধুইয়া মন্দিরে উঠিল, উপস্থিত কাহারও পানে না চাহিয়া বিগ্রহের সম্মুখে পুরোহিতের আসনে গিয়া বসিল।

ভবেশ চৌধুরী কাল দুপুরে কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, মিলাও তাঁহার সঙ্গে যাইবে। তাহার বন্ধু ও বান্ধবীরা কয়েকদিন আগে চলিয়া গিয়াছে।

আরও দশ বারো দিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা ভবেশ চৌধুরীর ছিল, কিন্তু মিলা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সে আর এখানে থাকিতে চাহিতেছে না।

মাত্র দশ পনেরো মিনিট তাঁহারা আসিয়াছেন। জয়ন্তকে ডাকিয়া পাঠানোতেও সে তাঁহার নিকট যায় নাই—এই অবজ্ঞা ভবেশ চৌধুরীর বক্ষে বিঁধিয়াছিল, সেইজন্য তিনি নিজেই আজ মন্দিরে আসিয়াছেন।

কতকাল—কতকাল আগে এই মন্দিরে তিনি আসিয়াছেন, আজ সে কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে একবার যখন তিনি আসিয়াছিলেন, তখন এই মন্দিরের ওই আসনে বসিয়াছিলেন দীনু ঠাকুর, আর দরজার বাহিরে এইখানে বসিয়াছিল একটী বৎসর তিনেকের শিশু। তিনি আসিতেই মন্দিরের দর্শক সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দীনু ঠাকুর পর্য্যন্ত পূজার আসন ত্যাগ করিয়া মহামান্য অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, বিচলিত হয় নাই শুধু অতটুকু একটী ছেলে। ঠোঁটের উপর একটা আঙ্গুল রাখিয়া সে যেন অবজ্ঞার চোখে তাঁহার পানে তাকাইয়াছিল, আজও তাহার সেই দৃপ্ত মুখখানার কথা ভবেশ চৌধুরীর মনে পড়ে।

আজ তাঁহার সম্মুখে পূজার আসনে বসিয়া সেই শিশু,—সে আজ যুবক,—স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—নিজের কর্ত্তব্য কাজ সে যথাযথ ভাবে করিয়া যাইতেছে, নির্ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে

তাহার ভাবে ভঙ্গীতে আজও ফুটিতেছে সেই দৃপ্তভাব। সিংহ শাবক সিংহে পরিণত হইয়াছে, পিতৃপুরুষের আসনে সে সত্যই দাবির জোরে বসিয়াছে।

মিলা স্তব্ধনেত্রে পুরোহিতের পানে চাহিয়াছিল। একদিন দূর হইতে এই লোকটাকে সে মুহূর্তের জন্য দেখিয়াছিল,—সেদিনকার কথা আজও তাহার মনে আছে। বন্ধুদের সহিত সে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল ম্যানেজার অমূল্য। এই লোকটী নদীতে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া সেদিন আহ্নিক করিতেছিল।

আজ মিলা স্পষ্টভাবে তাহাকে দেখিতে পাইল, জয়ন্ত যখন আরতি করিতে উঠিল, তখন মিলার মনে হইল—আরতি করা ইহাকেই মানায়, আর কাহাকেও মানায় না।

ছবিতে সে অ্যাপেলোর মূর্ত্তি দেখিয়াছে—সে মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির সাদৃশ্য মিলিয়া যায়। জীবনে অনেক লোককে মিলা দেখিয়াছে যাহারা সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার করে, ইহার সহিত তাহাদের কাহারও তুলনা হয় না।

আরতি সমাপ্তে জয়ন্ত বিগ্রহকে প্রণাম করিল, উদ্ধত জমিদার ও তাঁহার কন্যা প্রণাম করিলেন কি না তাহা সে দেখিল না। উপস্থিত সকলকে সে চরণামৃত বিতরণ করিবার পূর্ব্বে ভবেশ চৌধুরীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "চারণামৃত নিন—"

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "আগে ওদের দিয়ে এসে, তারপর দেখা যাবে।"

দর্শকদের চরণামৃত ও প্রসাদ বিতরণ করিয়া ফিরিয়া জয়ন্ত দেখিল, ভবেশ চৌধুরী উঠিয়াছেন। জয়ন্ত নিকটে আসিতে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"মাপ করো ভশ্চায, আমার ও সবে এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা নেই,

এরকম অবস্থায় কেবল তোমার খাতিরে নিলেও কোন ফল হবে না জেনে নিলুম না। যারা ঠাকুর দেবতা মানে তাদের বরং দাও,—তারা ভালো হোক—স্বর্গে যাক। আমার ভালো হওয়ার বা স্বর্গে যাওয়ার নেশা এতটুকু নেই,—নরকই আমার ভালো—"

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

জয়ন্তের চোখ দুইটী মুহূর্তের জন্য দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে কোশাকুশী নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

"শোন—শোন ভশ্চায—"

পথে নামিয়া পিছনে ডাক শুনিয়া জয়ন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল; ভবেশ চৌধুরী আগাইয়া আসিয়াছেন, পিছনে, তাঁহার কন্যা মিলা। দুইজন দ্বারোয়ান লাঠি ও আলো লইয়া সঙ্গে আসিতেছে।

জয়ন্তের কাছাকাছি আসিয়া তিনি বলিলেন, "কোন কথা না বলে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যাতে বুঝতেই পারিনি তুমি চলে আসছো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে সেইজন্যে আজ কয়দিন আগে তোমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। আমি কাল দুপুরে কলকাতায় চলে যাচ্ছি, আবার কবে আসব ঠিক নেই, সেইজন্যে আজকালের মধ্যেই কথা বলতে চাই।"

জয়ন্ত ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার সঙ্গে এমন কি কথা আপনার থাকতে পারে তা আমি নিজেই ঠিক করতে পারিনি—সেই জন্যেই যাইনি, আমার এ অপরাধ মাপ করবেন।"

খুসি হইয়া ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "না না, তোমার এ ব্যবহারে আমি এতটুকু রাগ করিনি—হ্যাঁ—তোমার নামটা বল; অনেক ছোট তুমি, তোমায় ভশ্চায বলে বার বার ডাকা চলে না।"

জয়ন্ত উত্তর দিল, "আমার নাম জয়ন্ত।"

তাহার পাশে পাশে চলিতে চলিতে ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "তোমার এতে অপরাধ হয়নি, বরং এই কার্য্য দেখে আমি খুসি হয়েছি যে একজনও এমন লোক আছে যে আমার অহঙ্কারকে আঘাত করে খর্ব্ব করতে পারে। আমি আমার জীবন পথে এমন একজন লোক পেলুম না যে আমায় আঘাত করে চেতনা দিতে পারে। লোকের কাছ হতে নিয়ত পেয়ে আসছি তোষামোদ, স্তুতি, সত্যই আমার ঘৃণা জন্মে গেছে জয়ন্ত, সমস্ত পৃথিবীর উপর,—এমন কি নিজের উপর পর্য্যন্ত আমার বিতৃষ্ণা এসেছে।"

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে তাঁহার পানে চাহিল, দ্বারোয়ানের করধৃত লণ্ঠনের আলোতে তাঁহার মুখ দেখা গেল না।

ভবেশ চৌধুরী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কাল সকালের দিকে অবশ্য করে একবার আমার বাড়ীতে এসো। তোমার এখানে পূজোর ব্যবস্থা আর থাকার বন্দোবস্ত—"

বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "থাকার ব্যবস্থা আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছি আর পূজোর জন্যেও আপনাকে কিছুমাত্র ভাবতে হবে না।"

ভবেশ চৌধুরী একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন "এখন পথ চলতে চলতে সে সব আলোচনা করা মিথ্যে; তুমি কাল একবার অতি অবশ্য করে আমাদের বাড়ী এসো, তখন যা হয় কথাবার্ত্তা হবে—।"

জয়ন্ত উত্তর দিল—"কাল আমি পূজোর পরে যাব আপনার বাড়ীতে। আচ্ছা, এখন চললুম—"

পাশে যে পথটা বাহির হইয়াছে, সে সেই পথ ধরিল। সামান্য

সময় তাহার সাদা কাপড় দেখা গেল তাহার পর গভীর অন্ধকারে সে মিলাইয়া গেল।

মুহূর্ত মাত্র ভবেশ চৌধুরী দাঁড়াইয়া তাহার গতি পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "অদ্ভুত ছেলে—"

মিলা বলিল, "এই অন্ধকার রাত্রে সে পথ চলতে পারবে বাবা?"—

ভবেশ চৌধুরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিদ্যুতের আলোর ওদের চোখ ঝলসায়নি, অন্ধকারের সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে-; আমাদের মত ওরা দিশা হারায় না।"

মিলা নীরবে তাঁহার সহিত চলিল—

"লোকটা কিন্তু মোটেই সুবিধার নয় বাবা, একটা ভদ্রতা পর্য্যন্ত জানে না। আপনি যে জমিদার, মাননীয় লোক, আপনাকে পর্য্যন্ত খাতির করে না—একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করলে না—এমনই অসভ্য লোক—"

অন্যমনস্ক ভাবে ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "কিন্তু ওকে সেই ভদ্রতাটুকু রাখার অধিকার আমরাই দেইনি মিল, আমাদের নির্ম্মম আচরণই ওকে এ রকম অসভ্য সাজিয়েছে। যার বাইরেটা এত সুন্দর তার ভেতর কখনও কদর্য্য হতে পারে না, ওর ব্যবহারকে অশিষ্ট ও কদর্য্য করে তুলেছি আমরাই।"

"আমরা—"

মিলা বিস্ময়োক্তি করিল।

ততক্ষণে তাঁহারা বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

ক্লান্তকণ্ঠে ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "হ্যাঁ—আমরাই করেছি। মানুষই তার ব্যবহারে পৃথিবীকে স্বর্গ গড়ে, আবার নরকেও পরিণত করে, মানুষই মানুষকে দেবতা গড়ে আবার সয়তানও করে। এই জয়ন্ত এই মন্দিরের কুলপুরোহিত বংশের সন্তান,—ওর বাপকে আমিই বিনা অপরাধে এখানকার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—তা তুমি জানো না মিল।"

মিলা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি তাড়িয়েছেন বাবা—"

ভবেশ চৌধুরী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাইশ বছর আগে তাঁর সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করেছি আমি। এই দেব-মন্দিরে যদি প্রকৃত অধিকার কারো থাকে—সে জয়ন্তের, হেম ভট্টাচার্য্যের নয়, এমন কি আমারও নয়। সেদিনকার তিন বছরের শিশু আজ পঁচিশ বছরের বলবান যুবকে পরিণত হয়ে জোর করে তার ন্যায্য অধিকার নিতে এসেছে আমার সাধ্য কি তাকে বাধা দেবার?"

তিনি নীরবে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

বারাণ্ডায় বসিয়াছিল ম্যানেজার অমূল্য মিত্র।

আজ দুপুরের ট্রেণে মিলা ও ভবেশ চৌধুরী কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন, জিনিসপত্র সব গুছানো হইয়া গিয়াছে। মিলা বাগানে বেড়াইয়া মালিকে পছন্দমত ফুল সংগ্রহ করিতেছিল, এই ফুলগুলিকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে।

গেটের কাছে জয়ন্তকে দেখা গেল,—সে ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু দ্বারোয়ান বাধা দিতেছিল। মিলা দরজার কাছে আসিতেই জয়ন্ত বলিল—"দেখুন তো, আপনাদের দ্বারোয়ান কি রকম লোক, কিছুতেই আমাকে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না।"

মিলাকে দেখিয়া দ্বারোয়ান সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, একটা সেলাম দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মিলা বলিল, "তুমি এঁকে ভেতরে আসতে বারণ করেছো কেন চন্দ্রসিং?"

দ্বারোয়ান উত্তর দিল, "ম্যানেজার বাবুর হুকুম, তিনি বলে গেছেন —সাহেবের সঙ্গে জরুরী কথাবার্ত্তা আছে, যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হবে কেউ যেন বাড়ীতে না আসে।"

মিলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল—

মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর কাউকে আসতে দিয়ো না, কিন্তু ইনি আসতে পারবেন। আপনি আসুন—বাবা বারাণ্ডায় রয়েছেন, যান—।"

জয়ন্ত একবার মাত্র এই মেয়েটীর পানে তাকাইল,—তাহার পর আস্তে আস্তে অগ্রসর হইল।—

অমূল্য ভবেশ চৌধুরীকে কতকগুলি কাগজপত্র দেখাইতে আসিয়াছিল।

জয়ন্ত বারাণ্ডার সিঁড়িতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিকে অমূল্যের দৃষ্টি পড়িল।

সেই লোকটী, যে দিন অমূল্যের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উপর আদেশ জারি করিয়াছিল। স্পষ্টই জানাইয়াছিল সে প্রজা নয় কাজেই জমিদারের কোন আদেশ শুনিতে বাধ্য নয়।

সেই লোকটীকে এখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অমূল্যের আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার পানে তাকাইয়া সে সবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল—। "একি, আমি যে দ্বারোয়ানকে বারণ কোরে এসেছি কেউ যেন এখন না আসে। হুকুম না শোনার জন্যে আজই আমি তাকে চাকরী হতে বিদায় দেব।"

জয়ন্ত শান্ত হাসিয়া বলিল, "মিথ্যে তাকেই দোষ দেবেন না ম্যানেজার বাবু, দোষ তার নয়—"

অমূল্য মাটিতে পদাঘাত করিল, সক্রোধে বলিল, "দোষ তার নয়, তবে কার বল,—তোমরা ?"

পিছন দিক হইতে মিলার কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—দ্বারোয়ান আপনার হুকুম ঠিকই মেনে চলে ছিল মিঃ মিত্র, বাবা এঁকে কাল এখানে বার বার করে আসতে বলেছিলেন ;—বাধা পেয়ে ইনি চলে যাচ্ছিলেন, আমি এঁকে ডেকে এনেছি। এর জন্যে গরীব দ্বারোয়ানের কাজ যেতে পারে না।

অমূল্য একেবারে এতটুকু হইয়া গেল,—সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া পড়িয়া সে কেবল মাত্র বলিল, কিন্তু এ সময়টা আমার নিজের কাজের সময়—

মিলা টেবলে ভর দিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আপনার কাজ একটু পরে হলেও চলবে। আগে এঁর সঙ্গে বাবার দেখাটা হোক, বাবা যা বলতে চান সে কথাবার্ত্তা হোক, তারপর আপনার বিষয় কর্ম্মের কথা হবে এখন।"

জয়ন্তের পানে তাকাইয়া সে বলিল, "আপনি একটু বসুন, আমি বাবাকে খবর দিচ্ছি।"

লঘুপদে সে চলিয়া গেল।

জয়ন্ত বসিল না, বারাণ্ডার ধারে ধারে তারে ঝুলান টবে পুষ্পিত অর্কিড গাছগুলি দেখিতেছিল।

অমূল্য নিষ্পলকে এই লোকটার পানে তাকাইয়া রহিল, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল অথচ কিছু বলিবার উপায় তাহার নাই। এই দুর্ব্বিনীত লোকটা পথে তাহাকে অপমান করিয়াছে, সেদিনকার সে ব্যথা আজও তাহার মনে জাগিয়া আছে।

খালি পা—পায়ে একজোড়া জুতা পর্য্যন্ত নাই, গায়ে হাতকাটা একটা বেনিয়ানের উপর চাদর জড়ানো, পরণে একখানা থান—সবই খদ্দরের—

অমূল্য মনে মনে বলিল—"স্যাভেজ ব্রুট—"

মুখের অস্ফুট উক্তি শুনিতে পাইয়া জয়ন্ত মুখ ফিরাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কিছু বলছেন—?"

অমূল্য অবজ্ঞার সহিত উত্তর দিল—"না—"

ভৃত্য আসিয়া সেলাম দিল, বলিল, "সাহেব একবার ভশ্চায বাবুকে ডাকছেন,—"

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া অমূল্য বলিল, "তিনি কোথায়, এখানে আসবেন না—?"

ভৃত্য থতমত খাইয়া বলিল, "তিনি ভেতরের ঘরে বসেছেন,—আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি—"

সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

একটু পরে মিলা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বাবার মাথা ধরে উঠেছে মিঃ মিত্র, তিনি আর কাগজ পত্র দেখতে পারবেন না বললেন। আপনি এখন যেতে পারেন, যেদিন কলকাতায় যাবেন সেদিন বরং নিয়ে যাবেন, বাবা দেখবেন।"

অমূল্যের মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, ছড়ানো কাগজ পত্র গুলা কুড়াইয়া প্যাডের মধ্যে তুলিয়া ফিতা দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—

"হ্যাঁ, আমি অগত্যা চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলে যেতে চাই মিল, আশা করছি পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু গোপন ভাবে কথা বলবো।"

"গোপনভাবে—"

মিলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া জয়ন্তের পানে তাকাইয়া সে বলিল, "আপনি পাঁচ মিনট অপেক্ষা করুন ভশ্চায মশাই, আমি এখনি আসছি—"

অমূল্যের পানে তাকাইয়া বলিল, "আসুন,—"

সে নীচে বাগানের পথে নামিয়া পড়িল, অমূল্য প্যাডখানা হাতে লইল তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল,—

চলিতে চলিতে একটা কুঞ্জের আড়ালে মিলা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এখানে আশা করছি আপনার কথা হতে পারবে,—বলুন কি বলতে চান—?"

অমূল্য যে কথাটা বলিবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিল তাহা বলিতে গিয়া থতমত খাইয়া গেল,—

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার সেই কথাটা আজ বলার কথা ছিল মিল—"

মিলা অন্তদিকে তাকাইয়া বলিল, "সে কথা আর দুদিন পরে হলেও চলে মিঃ মিত্র। অমূল্য বলিল, "আমার আশা ছিল—এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়েই—"

বাধা দিয়া মিলা, বলিল "হ্যাঁ, কলকাতায় ফিরে গিয়ে বাবাকে এ সম্বন্ধে বলবেন—"

ফিরিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া সে বলিল, "আশা করি আর আপনার কোন কথা বলবার নেই—?"

অমূল্য কেবল মাত্র বলিল, "না—"

মিলা একটা ছোট নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

জয়ন্ত বারাণ্ডায় পদচারণা করিতেছিল,—মিলা বলিল, "আসুন, বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—"

মিলা অগ্রসর হইল—জয়ন্ত তাহার পিছনে ভিতরে প্রবিষ্ট হইল—।

প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর সেকালের সমৃদ্ধিশালী জমিদারগণের রুচি অনুযায়ী সজ্জিত—বর্ত্তমান সাজে সাজ এ সব ঘরে নাই। এই রকম কয়েকটী ঘর ছাড়াইয়া জয়ন্ত যে হলে গিয়া পৌঁছাইল, সেই হলে ভবেশ চৌধুরী বসিয়াছিলেন।

সেকালের ঝাড় লণ্ঠন এ ঘরের চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটী দুলিতেছে। দেয়ালে সেকালের দেবদেবীদের ছবি,......মেঝে গালিচা মোড়া, তাহারই উপর কয়েকখানি টেবল, কতকগুলি চেয়ার

পাতা। মনে হয় এইগুলিই মাত্র বর্ত্তমান জমিদারের আনিত,—কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ব জমিদারের কীর্ত্তি সমূহ এতটুকু নষ্ট করেন নাই, যেখানে যার যা সেখানেই রাখিয়াছেন।

এই ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এ বাড়ীর কোথাও যে দেবদেবীর মূর্ত্তি এখনও আছে তাহা সে কোনদিনই ভাবে নাই।

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "এসো জয়ন্ত,—আমার আজই চলে যাওয়ার কথা, তার আগে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে নেওয়া যাক। মিল, তুমিও বসো মা, এ সব কথা তোমারও শুনে রাখা দরকার মনে করি।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ার লইয়া বসিল, মিলা পিতার চেয়ারের পিছনে ভর দিয়া দাঁড়াইল।—

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "তোমার পৈতৃক অধিকার আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম জয়ন্ত, এর পরে আর কারও কোনও দাবি রইলো না। হেম ভশ্চায ভাটপাড়ায় চলে যাবেন, তাঁকে আমি প্রতিমাসে কিছু করে সাহায্য করবো বলে দিয়েছি। তোমার পৈতৃক ভিটায় দুখানা ঘর তুলবার খরচের ব্যবস্থা করে দিলুম, যে পর্য্যন্ত না ঘর হয় তুমি এখানে —এ বাড়ীতে থাকতে পারো—"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার প্রচুর অনুগ্রহ কিন্তু আমার এখানে থাকা অসম্ভব,—আমি মন্দিরেই থাকব স্থির করেছি।"

মিলা বলিল, "তা হয় না। আমি আজ ভোরে মন্দিরে গিয়েছিলুম, দেখেছি সেখানে বাস করবার মত ঘর নেই।"

জয়ন্ত বলিল, "বারাণ্ডায় আমি থাকার ঠিক করেছি চৌধুরীমশাই—

ভবেশ চৌধুরী মাথা নাড়িলেন, "না না বারাণ্ডায় থাকা একেবারেই অসম্ভব। বৃষ্টি আছে, ঝড় জল আছে, বারাণ্ডায় থাকা কাজেই চলবে না। তোমার এখানে থাকবার আপত্তি থাকে—যেখানে তুমি আছ সেইখানেই থাকো কি বল। তোমার ঘর ঠিক হলে তুমি সেখানে চলে যেয়ো—। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি কিছু মানিনে বলেই বোধ হয় তুমি এ বাড়ীতে থাকতে চাও না।"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "কতকটা তাই—আমি আপনার এই করুণাটুকু না নিতে পারলেই ধন্য হব। আমার ভিটের মাটীটুকু আমার থাক, ঘর আমি বাঁধতে চাইনে। যদি আমি পারি, কোনদিন ওখানে নিজেই ঘর তুলতে পারব। পূজোর অধিকার আমি নিজেই জোর করে নিয়েছি, আপনি না দিলেও আমার সে অধিকার হতে আপনি বঞ্চিত করতে পারতেন না।"

আহত হইয়া ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "একদিন হয়তো ভুলবশতঃ তোমার পিতাকে অধিকারচ্যুত করেছিলুম, আমার সেই ত্রুটিটাই ধরে রেখে দিলে জয়ন্ত?"

জয়ন্ত মাথা নাড়িল, বলিল, "না, কেবল সেই কারণই নয় চৌধুরী মশাই, আসল কারণ আপনি নাস্তিক, আপনি কিছুই মানেন না। এর চেয়ে যদি আপনি খৃশ্চান হতেন, মুসলমান হতেন—জানতুম আপনার একটা ধর্ম্ম আছে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারতুম, হয়তো আপনার এই দানটুকু পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতুম। কিন্তু আপনি কিছু নন,—আপনি কোন গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ নন—। শুধু সেইজন্যে—শুধু সেই কারণে আমি আপনাকে ঘৃণা করি চৌধুরী মশাই।"

ভবেশ চৌধুরীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। মিনা উত্তেজিত কণ্ঠে

বলিল, "আপনি আমার বাবাকে ঘৃণা করেন—আমাদের বাড়ীতে বসে, আমার বাবার মুখের সামনে এ কথা বলতে পারলেন, আপনার সাহস হল ?"

জয়ন্ত হাসিল, বলিল, "সত্য কথা বলতে সাহস হারানোর কারণ আমি খুঁজে পাইনে। হয়তো আমি মিথ্যে কথা বললেই আপনারা খুসি হতেন, কিন্তু আমার জীবনে পরম সান্ত্বনার বিষয় এই—জেনে শুনে মিথ্যে কথা আমি খুব কমই বলেছি। অপ্রিয় সত্য কথা যে প্রীতিপ্রদ নয় তা আমি জানি, তবু বলতে হল—আর এরজন্যে আপনাদের যে কষ্ট দিলুম—আমি সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "না, তুমি সত্য কথাই বল জয়ন্ত,—এতে সাময়িক এতটুকু ব্যথা হয়তো লাগে—কারণ সত্যই কেউ আঘাত করে আমায় সচেতন করেনি—এ কথা আমি আগেই তোমায় বলেছি।"

জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি অন্যায় কোনদিন সইতে পারি নি চৌধুরী মশাই—আর সেই জন্যেই আমি উন্নতি করতে পারলুম না। আপনার এখানেও যে চিরদিন থাকতে পারব না তা জানি, কোনদিন কোন সত্য কথা বলার অপরাধে এখান হতে আমাকেও চলে যেতে হবে। আজ আপনি যা সহ্য করলেন, কাল হয়তো তা আপনাকে রীতিমত ক্রুদ্ধ করে তুলবে তাও জানি। এবার আমাকে বিদায় দিন, আমায় এখন পূজোর কাজ করতে হবে।"

ভবেশ চৌধুরী তাহার সঙ্গে সঙ্গে বারাণ্ডা পর্য্যন্ত আসিলেন, বলিলেন, "আমি আশা করছি তোমার পৈত্রিক অধিকার নিয়ে তুমি এখানেই থাকবে—"

জয়ন্ত একটু হাসিল মাত্র।

সে চলিয়া গেল—

ভবেশ চৌধুরী যতদূর তাহাকে দেখা যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিলেন।

মিলা সেইখানেই বসিয়া আছে, অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছে কে জানে।

ভবেশ চৌধুরী বসিতে বসিতে বলিলেন,—"গোখরো সাপের বাচ্চা, ছোবল দিতে জানে, বিষহীন ঢোড়া সাপের মত পা জড়িয়ে থাকে না।"

মিলা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "আপনার এ গোখরো সাপকে আমি মোটেই পছন্দ করতে পারলুম না বাবা, যে আপনাকে ঘৃণা করে, তাকে আমি সহ্য করতে পারব না।"

ভবেশ চৌধুরী হাসিয়া উঠিলেন—"পাগলী,—কিন্তু তোর বাপ যে ঘৃণাকর কাজই করেছে মা—তবে কেন সে ঘৃণার পাত্র হবে না?"

মিলা বলিল, "ভশ্চায্যের বাপকে আপনি পূজার অধিকার দেন নি —সেও তো তার উদ্ধত স্বভাবের জন্যেই। আপনি ভূস্বামী—মনিব, সে মনিবের আদেশ মানে নি—মনিবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাতে তাকে কর্ম্মচ্যুত করা তো অবৈধ হয়নি বাবা—।"

ভবেশ চৌধুরী চুপ করিয়া রহিলেন।

উর্ম্মির দিন কাটে।

ছয় সাত মাস আগে—জয়ন্ত যেদিন বিদায় লইয়া গিয়াছে তাহার পর হইতে উর্ম্মি সিনেমার সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছে,—উর্ম্মির ছবি আর পর্দ্দার গায়ে ফুটে না, উর্ম্মির নাম আর লোকের মুখে মুখে ফেরে না।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে সে ফিলম কোম্পানিতে যোগ দিয়াছিল, সে এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজার অনেক বুঝাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতের উন্নতির আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু উর্ম্মি জবাব দিয়াছিল, সে আর এ কাজ করিবে না—

হঠাৎ সংস্কৃত শিখিবার দিকে তাহার অত্যন্ত বেশী রকম ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল, সেইজন্য সে একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোককে মাসিক বেশী করিয়া বেতন দিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।—ছয়মাসের মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, জয়ন্তের বইগুলা লইয়া এখন সে কেবল নাড়াচাড়াই করে না, অনেক কিছু পড়িতেও পারে।

অতি সযত্নে একটা স্বতন্ত্র ছোট কাঁচের আলমারিতে সে জয়ন্তের বই-গুলি গুছাইয়া রাখিয়াছে।—এ সব বইয়ে সে যখন তখন হাত দেয় না, স্নানান্তে অতি পবিত্রভাবে এ বইয়ে সে হাত দেয়।

জয়ন্তের কথা সে ভুলিতে পারে না।

জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে সে আসিয়াছে, অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে। এমন মানুষ সে তাহার জীবনকালের মধ্যে

দেখে নাই—সে আজও নিজের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে পা দেয় নাই, কেবলমাত্র মাকে লইয়াই যাহার জগৎ,—বাহিরের কোন বার্ত্তা সে পায় নাই। শিশুর মত সরল মুখ, শিশুর মত সরল কথাবার্ত্তা, এমন লোক অতি সহজেই মানুষের মন আকর্ষণ করিতে পারে—।

উর্শ্মি মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে,—জয়ন্ত শীঘ্রই আসিয়া বই লইবে বলিয়া গিয়াছিল—এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সে কোথায় গেল—কেমন রহিল কে জানে—কে তাহার খবর রাখিয়াছে—কে তাহাকে চিনে?

ওদিককার অংশের ভাড়াটে সুরেন মৈত্র আজও সেই ঘরখানিতেই আছেন, জয়ন্তের ঘর চাবি বন্ধ অবস্থায় আজও পড়িয়া আছে। দু'চারজন ভাড়াটে সে ঘর ভাড়া লইতে আসিয়াছিল, উর্শ্মি তাহাদের বিদায় দিয়াছে; স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে ও ঘর সে ভাড়া দিবে না—।

সেদিন হঠাৎ সে মাঝখানকার দরজা খুলিয়া ওদিককার অংশে গিয়া উপস্থিত হইল—।

সুরেনবাবু বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছিলেন। ইঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ঝগড়া চলিত, আবার মিটমাটও হইয়া যাইত সঙ্গে সঙ্গে।

উর্শ্মি দরজা খুলিতেই চোখে পড়িল—সুরেনবাবুর স্ত্রী কোমরে কাপড় জড়াইয়া আস্ফালন করিতেছেন, আর সুরেনবাবু বামহস্তে হুঁকা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পথ চলিবার সম্বল লাঠিটা লইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে আরও একটু আগাইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এমন মূর্খ নহেন যে আগাইয়া আসিবেন।

হঠাৎ এই অবস্থায় উর্শ্মিকে দরজার উপর দেখিয়া দুইজনেই থতমত

খাইয়া গেলেন। সুরেনবাবু লাঠিটা পিছন দিকে ফেলিয়া কলিকায় আগুন আছে কি না পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রী কোমরের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নিমেষে আবার শান্ত সংযত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন,— হাসিমুখে ডাকিলেন, "এসো মা—এসো,—তোমায় আর দেখতে পাইনে—"

সুরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "মায়ের কি তোমাদের মত অনন্ত অবকাশ আছে? তোমাদের যেমন—কাজ নেই কর্ম্ম নেই, ভাত রাঁধা আর খাওয়া, কাজেই হজম করবার জন্তে দিনরাত ঝগড়া করার দরকার। একটা দিন তো এমন যায় না যে দিন—'

স্ত্রী ঝঙ্কার দিলেন, "তুমি থামো বাপু, বেশী বকো না আবল তাবল। একসঙ্গে ঘর করতে গেলে এমন একটু খিটিমিটি বেধেই থাকে,—থালা বাসনে ঠোকাঠুকি বাধে না? তাই বলে পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে বেড়ানো তোমার মত বুড়ো মানুষের উচিত কাজ হচ্ছে। এসো মা—বসবে এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

উর্ম্মি বলিল, "বসব না, আমার একটা দরকার আছে, জয়ন্তবাবুর ঘরটা একবার খুলব—আসুন না মা, একটু দাঁড়াবেন আমাকে।"

সুরেনবাবুর স্ত্রী অগ্রসর হইতে হইতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "নতুন ভাড়াটে এসেছে বুঝি?"

উর্ম্মি হাতের চাবি দিয়া তালা খুলিয়া বলিল, "না, ভাড়াটে এখনও ঠিক করিনি। লোকটা কিছু বলে যায়নি, তার জিনিসপত্রও ঘরে পড়ে আছে, ওগুলো না নিলেই বা কি করে অন্য ভাড়াটে বসানো যায়? আচ্ছা, তাঁর খবর আপনারা কিছু পেয়েছেন কি?"

সুরেনবাবু পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন,—বলিলেন, "কোথায় গেছে

কি করে বলব মা—? সে লোকটাই অমনি, তিনবছর একসঙ্গে থেকেও তাকে চিনতে পারিনি। ভিজভিজে বেড়াল মা—ভিজভিজে বেড়াল,—ও সব ভড়ং ছিল ওই যে শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রপাঠ—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন, উর্ম্মি মুখ ফিরাইয়া দৃপ্ত নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়াছিল ; সেই চোখের পানে দৃষ্টি পড়িতে তিনি আর একটী কথা বলিতে পারিলেন না।

দরজা খুলিয়া উর্ম্মি ভিতরদিকে তাকাইল,—ওদিককার একটা জানালা খোলা ছিল—ঘরের ভিতরকার সব কিছু দেখা যাইতেছিল।

একপাশে পড়িয়া আছে ভাঙ্গা দুইটী বাক্স, দেয়ালে একটা চিঠির ফাইল হয়তো উহার মধ্যে চিঠি পত্র আছে যাহাতে জানা যাইতে পারে জয়ন্তের যাইবার স্থান কোথায়—কোথায় সে গিয়াছে। তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি না সে সন্ধানও হয়তো পাওয়া যাইতে পারে।

উর্ম্মি বলিল, "আপনি জয়ন্তবাবুকে সত্যিই খারাপ বলে জেনেছেন, কি করে জানলেন ?"

সুরেনবাবু মাথা চুলকাইতেছিলেন। স্বামীকে বিপন্ন দেখিয়া স্ত্রী তাঁহার হইয়া উত্তর দিলেন, "না না, সত্যি উনি কি করে তা জানবেন ? তবে মোটামুটি ধরেছেন যে সে তোমার পাঁচমাসের ভাড়া দেয়নি—অমনি চুপি চুপি পালিয়েছে, তোমায় একদিন যা না তাই বলেছে—"

বাধা দিয়া উর্ম্মি বলিল, "অবশ্য চুপি চুপি পালান নি, ভাড়ার জন্যে কতকগুলো বই রেখে গেছেন—"

সুরেনবাবু হাসিলেন—বলিলেন, "সেই পুরোণো পচা বইগুলো—সেগুলো শেষে তোমার কাছে বুঝি রেখে গেছে মা লক্ষ্মী ; আমার কাছে নিয়ে এসেছিল—কিন্তু আমি তেমন বোকা নই যে ওই পুরোণো বই

কখানা রেখে পঁয়ত্রিশ টাকা দেব। সে গুলো তা হলে তোমার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছে। এই তো—শোন গো, আমার কথা মিথ্যে কি না শোন—"

একটা দম লইয়া তিনি বলিলেন, "আমি তখন বলেছিলুম কয়েকটী মেয়ের টিউশানী নিতে, কিন্তু তাতে নাকি ওর চরিত্রতায় বাধে, তাই টিউশানি নিলে না।—"

উর্ম্মির মুখের কঠিন ভাব লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী বলিলেন, "থাক না, তোমার অত মাথাব্যথায় দরকার কি। শোন মা ওর মাথাব্যথাটা একবার দেখ। এই নিয়েই না বাধে আমার সঙ্গে ঝগড়া; আমি বলি—কি দরকার নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করতে যাওয়ায়, পরে যদি তোমার সে উপকার নাই বুঝতে পারলে? তোমায় বলব কি বাছা—হাজার বলি—হাজার বকি, তবু যদি আমার একটা কথা কাণে তোলেন। আমি বলি কি—কি দরকার এতে—কি লাভই বা হবে। এই যে তুমি জয়ন্তকে কাজ করে দিতে চাইলে—সে নিলে না উল্টে তোমায় যা না তাই বললে। করলে তারই ভালো হতো…এ রকম ছন্নছাড়া হয়ে হেসে যেতো না।"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "আর কাজ করতোই বা কি—গুণ্ডামী করে সব ঘুচিয়ে দিতো। ওর মা বেঁচে থাকতেই আর দু-চার জায়গায় কাজ নিয়েছিল—না—গুণ্ডামী করে ছেড়ে দিলে—।"

উর্ম্মি ততক্ষণ ফাইল ও বাক্স লইয়া বসিয়াছে। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুণ্ডামী করা কি রকম—মারামারি করেছেন নাকি?"

ললাটে করাঘাত করিয়া স্ত্রী বলিলেন, "পোড়াকপালে, সেই রকম ছাড়া আর কি। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি না, মিথ্যে, জোচ্চুরী, ধাপ্পাবাজি,

এ সব উনি সইতে পারেন না—তাই সব জায়গায় কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরেই বই নিয়ে কাটাতেন আর মা এখানে ওখানে কাজ করে, ভিক্ষে করে ছেলেকে খাওয়াতো। তাই না উনি বলছেন ভিজভিজে বেড়াল,—দেখে কেউ ওকে বুঝতে পারেনি—চিনতে পারেনি।"

উর্ম্মি কাগজ পত্র দেখিতেছিল—কেবলমাত্র একটা উত্তর দিল—"হু—"

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাজের অছিলায় সুরেনবাবুর স্ত্রী সরিয়া গেলেন, সুরেনবাবু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন।

উর্ম্মি বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা ছিন্ন কাপড় জামা ছাড়া কিছু পাইল না,—ফাইলে যে সব পত্র ছিল সেইগুলা খুঁজিয়া দেখিল—একটী মাত্র গ্রামের নাম পাওয়া যায়, গোপালপুর, কিন্তু সে গ্রাম কোথায় তাহার কোন উল্লেখ নাই।

একখানা পত্র চোখে পড়িয়াছিল, বৎসরখানেক পূর্ব্বে গোপালপুর গ্রাম হইতে জয়ন্তের মাকে কে পত্র লিখিতেছেন। তাহাতে জানাইয়াছেন ভবেশ চৌধুরী বালিগঞ্জে——নম্বরে থাকেন, জয়ন্তের মা যদি তাঁহাকে একবার গিয়া ধরেন, ঠাকুর বাড়ীর কাজ পাওয়া জয়ন্তের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

এই পত্রখানা হস্তগত করিয়া ফাইল যথাস্থানে রাখিয়া উর্ম্মি উঠিল।

ধূলায় ঘরখানা ভরিয়া আছে, কোণে কোণে মাকড়সায় জাল তৈয়ারী করিয়াছে, কতদিন এ ঘরে মানুষের পদার্পণ হয় নাই। জয়ন্ত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া চাবি উর্ম্মিকে পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া গেছে, ঘরে তাহার কয়েকটী জিনিষ রহিল, উর্ম্মি ইচ্ছা করিলে সেগুলা নিজের বাড়ীর এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়া এ ঘর ভাড়া দিতে পারে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উর্ম্মি বাহির হইয়া দরজায় তালা বন্ধ করিল,—

সুরেন মৈত্রের স্ত্রী তখন একখানা ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতে বসিয়াছেন, সুরেনবাবু নিকটে বসিয়া ছিন্নাংশ ঠিক করিয়া ধরিতেছেন। এই মুহূর্ত্তে দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না খানিক আগে ইহাদের মধ্যে তুমুল বিবাদ হইয়া গেছে, হয়তো মারামারিও বাধিত,—মারামারি হইলেও ব্যাপারটা এত শীঘ্র যে আপোষে মিটিয়া যাইত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উর্ম্মি ডাকিয়া বলিল, "চললুম মা—নমস্কার—"

ছোট দরজা দিয়া ওদিকে গিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

১৪

আকাশে নিবিড় কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, মুহুর্মুহু একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া যাইতেছিল। উর্ম্মি হার্ম্মোনিয়াম লইয়া বসিয়াছিল—অন্যমনস্কভাবে হার্ম্মোনিয়ামের সুরের সহিত সুর মিলাইতেছিল—

শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে—
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়িয়ে এলে।

বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল—বাদল বাতাস বৃষ্টিকণা বহিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছিল, উর্ম্মি হার্ম্মোনিয়াম বন্ধ করিয়া জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে; আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকায় এখনি

সন্ধ্যা নামিয়াছে মনে হইতেছে। পথে আলো জ্বলিয়াছে, পার্শ্বের পার্কেও আলো জ্বলিতেছে। অন্যদিন পার্ক জনমুখর থাকে, আজ জনশূন্য।

ঊর্ম্মি আকাশের পানে চাহিল, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, অদৃশ্য হস্তে কে যেন আকাশের গায়ে কালি মাখাইয়া দিয়াছে। নিচে পার্কে যে লাইট পোষ্ট ছিল তাহার চারিধারে বৃষ্টিকণা কুয়াসা সৃষ্টি করিয়াছিল। ঊর্ম্মি সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

অবিরাম বৃষ্টির শব্দ কাণে আসিতেছে—ঝম ঝম ঝম,—

পাশেই একটী দরিদ্র বস্তী রহিয়াছে—ঊর্ম্মির এই জানালা হইতে ওই বস্তীর ভিতরকার অনেক কিছু দেখা যায়। উপরে খোলার চালা, মাটি লেপা বেড়ার দেয়াল, তাহার মাঝে মাঝে এক একটা ছোট জানালা আছে, সেই জানালাপথে যেটুকু বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় তাহাই যথেষ্ট।

বস্তীর ভিতরে যে ঘরটা জানালার ঠিক সামনে পড়ে, সেই ঘরে থাকে একটী মেয়ে—এবং তাহার স্বামী। এই মেয়েটীকে ঊর্ম্মি যখনই জানলায় আসে দেখিতে পায়। ইহার মিষ্ট মুখখানি ঊর্ম্মির বড় ভালো লাগিত সেইজন্য সে মাঝে মাঝে আসিয়া এই জানালায় দাঁড়াইত।

আজও চোখে পড়িল সেই মেয়েটীকে—

বারাণ্ডার এক ধারে একটী উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া সে নিকটে বসিয়া আছে। লালপাড় শাড়ি তাহার পরণে, সিঁথায় উজ্জ্বল সিঁদুর জ্বলিতেছে, হাতে কেবল দুইটী লাল সাঁখা, আর কোন অলঙ্কার তাহার দেহে নাই।

ঊর্ম্মির মনে হয়—পঙ্কে পদ্মফুল ফুটিয়াছে। বস্তীর এই অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে এ সৌন্দর্য্য মানায় না, এমন রূপ খুব কমই সে দেখিয়াছে।

ঘরের ভিতর খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে।

ছোট এতটুকু ঘর, বাহিরের আয়তন দেখিয়া তাহাই মনে হয়। সেই ঘরটা সাজাইতেই তাহার দিন কটিয়া যায়। স্বামী সকাল বেলা বাহির হইয়া যায়, বেলা বারোটার সময় ফিরিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া নেয়, এ সময় স্ত্রীর সহিত বেশী কথাবার্ত্তা বলিবার অবকাশ তাহার মিলে না। আবার সে যখন ফেরে—রাত্রি তখন এগারোটা বাজিয়া যায়। নিজের বিছানায় শুইয়া উর্ম্মি প্রতি রাত্রে কড়া নাড়ার শব্দ পায়,—আহ্বান শুনিতে পায়—"কমলা—"

বড় মিষ্ট নাম—এই নামটী উর্ম্মির বড় ভালো লাগে, সে মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কমলা যে ওই বউটীরই নাম তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। নামের সঙ্গে আকৃতির সুন্দর মিলন আছে,—নাম ও নামের মানুষ উভয়েরই উভয়ের উপর সমান নির্ভর করিতেছে।

বোধ হয় মাস তিনেক তাহারা আসিয়াছে ইহার মধ্যে কয়দিন উর্ম্মির সহিত মেয়েটীর চোখাচোখীও হইয়া গেছে, মেয়েটী সন্ত্রস্তভাবে চোখ নামাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন রাত্রে উর্ম্মি এই জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—স্বামী তখন ফিরিয়াছে, স্ত্রী তাহার আহারের জায়গা করিয়া দিতেছে। কতখানি আন্তরিকতার সহিত সে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যায় উর্ম্মি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাই দেখে। এইরূপ সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করাকে সে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে পারে না—কর্ত্তব্যের উপর আরও কিছু আছে—তাহার নাম ভালোবাসা।

উর্ম্মি ওথেলো ডেসডিমোনার গল্প পড়িয়া একদিন অবিশ্বাস করিয়াছিল। ডেসডিমোনার মত সুন্দরী মেয়ে ওথেলোর মত কুৎসিত লোককে

অতখানি ভালোবাসিতে পারে—ইহা সত্যই বিশ্বাসের অতীত। কবি বা লেখকেরা কল্পনা জগতে বিচরণ করেন এবং অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়া তুলেন সে তাহা জানে। বাস্তবের এতটুকু মাত্র লইয়া কল্পনায় ফেণাইয়া তাঁহারা অতি সুন্দর করিয়া গড়িতে প্রয়াস পান, তাহার মধ্যে যে কতখানি ফাঁক থাকিয়া, যায়, লোকে বিশ্বাস করিবে কি না তাহা তাঁহারা দেখেন না,—সৃষ্টির আনন্দটুকুই হয় তাঁহাদের প্রাপ্য। সেক্সপীয়ার ওথেলো ডেসডিমোনাকে আঁকিয়া সেই আনন্দ-টুকু উপভোগ করিয়াছেন, লোকে তাঁহার সৃষ্ট অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত দেখিয়াছে—তবু হয়তো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

বিশ্বাস করিয়াছে সেদিন—যেদিন সে কমলার মত অপূর্ব্ব সুন্দরীর স্বামীকে দেখিয়াছে; সেই মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছে—লেখকের ওথেলো ডেসডিমোনা চিত্র অঙ্কিত করিবার মূলে এই রকমই কঠোর বাস্তবের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

এই কালো এবং কুৎসিত লোকটী ওই সুন্দরী মেয়েটীর স্বামী একথা কেন সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ঔৎসুক্য এবং আরও জানিবার আগ্রহ তাহাকে এই জানালার কাছে আজও তাই টানিয়া আনিয়াছে।

স্বামীর বোধ হয় অসুখ করিয়াছে—ঘরের ভিতর বিছানায় শুইয়া আছে। মেয়েটী উনানের কাজ সারিয়া একটা এনামেলের বাটিতে করিয়া একটু সাগু লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল—স্বামী সাগু খাইতে চাহিতেছে না; স্ত্রী তাহাকে ভুলাইয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

বুঝা গেল—হাতে পয়সা নাই, স্বামী সাগুতে লেবু, চিনি দিয়া খাইতে

চায়, নচেৎ সে শুধু সাগু খাইবে না। আজ কয়দিন সে জ্বরে পড়িয়া আছে—একটু দুধ না হইলে সে বাঁচিবে কি করিয়া ?

একটু পরেই মেয়েটি খালি বাটি হাতে বাহির হইয়া আসিয়া বাটিটা উনানের ধারে রাখিয়া বসিয়া পড়িল—তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঊর্ম্মি আর জানালার কাছে দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিয়াছিল—সে ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এক পয়সার লেবু—এক পয়সার মিছরী, ওই দুর্ভাগা পরিবারের কাছে এই দুই পয়সার মূল্য এখন দুই কোটি টাকা।

ঊর্ম্মির অর্থের অভাব নাই—

স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটে,—তাহার দাসদাসীরাও সুখে দিন কাটায়। আর তাহারই ঘরের পাশে ওই মেয়েটী কি কষ্টেই না দিন কাটাইতেছে। স্বামীকে চিকিৎসক দেখানো তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, এক পয়সার মিছরীও তাহার জুটে না।

এই রকম দুঃস্থ কত পরিবারই না আছে। ইহারা দিনের পর দিন এমনই অভাবের মধ্যে দিন কাটায়, তবু মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকটে ভিক্ষা চাহিতে পারে না। কত ঘরে চলিয়াছে অনাহার, অর্দ্ধাহার ; সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোক আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়ায়।

ঊর্ম্মির মনে পড়িল—অনেকদিন আগেকার একটী দিনের কথা—স্যুটিং করিতে গিয়া একখানি পর্ণকুটিরে সে যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, সে দৃশ্য আজও তাহার মন হইতে মুছে নাই।

এমন কত আছে—কত নর, কত নারী, কত শিশু, দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণে একটু একটু করিয়া পিষিয়া মরে।

এ কি বিরাট বোঝা ইহাদের মাথায় চাপিয়াছে ঠাকুর?—পিতৃ-পুরুষের বোঝা ইহারা নামাইবার স্থান পায় নাই, বংশপরম্পরা ইহার জের টানিয়া চলিয়াছে। কবি ইহাদের লইয়া কবিতা লেখে, কত লেখক ইহাদের লইয়া কত গল্প উপন্যাস রচনা করে, কিন্তু প্রকৃত দুঃখ বেদনা লেখায় ফুটিলেও কয়জনে তাহা পড়িয়া বেদনা অনুভব করে? এই সব দরিদ্রের দুঃখ বর্ণনা করিয়া যাহারা দু-পয়সা পায়, তাহারা ইহাদের জন্য আধ পয়সাও ব্যয় করে না।

উর্ম্মি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।—

ইহারা ভিক্ষা চাহিবে—কাহার কাছে, কে ইহাদের সাহায্য করিবে, কে ইহাদের দেখিবে? ইহারা ভিক্ষা চাহিতে গেলে বিতাড়িত হয়, ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার ইহাদের কই?

বাহিরে তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে।

উর্ম্মি ভাবে—সে যদি অমনিই দরিদ্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করিত—অমনিই ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিত—তাহাতেও সে থাকিত পরম সুখী। সে যে অবস্থায় যেখানে আছে, নাম, যশ, অর্থ প্রচুর মিলিলেও শান্তি মিলিল না।

যদি সে একবার সন্ধানটাও পাইত—কে তাহার মাতা কে তাহার পিতা—,

কিন্তু কে তাহাকে সে সন্ধান দিবে। সন্ধান দিতে পারেন একা অনাদি মিত্র, তিনি কিন্তু কোথায়? আজ উর্ম্মির মনে হইল—সে সন্ধান তাহার লওয়া চাই-ই এবং সেইজন্যই সে তৎক্ষণাৎ অনাদি মিত্রকে একখানা পত্র লিখিতে বসিল।—

১৫

মোক্ষদা মুখ তুলিল, বলিল, "তিনি যে তোমার বাপ নন তা তুমিই বা কি করে বুঝলে উর্ম্মি?—বাপ না হলে অনর্থক তোমার সকল ভার তিনি বয়ে বেড়াবেন কেন, যাতে তুমি সৎপথে চলতে পারো—তার জন্তেই বা তাঁর এত আগ্রহ কেন?"

উর্ম্মি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমিও তাই ভাবি।—সত্যি আমার সন্দেহ হয় মাসীমা, তাঁকে আমি চিনতে পারলুম না।—আমি বুঝতে পারিনে—যদি আমি তাঁর মেয়েই হব—কেন আমায় অনাথ-আশ্রমে রেখে মানুষ করেছিলেন?—তাঁর কি আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না যার কাছে আমাকে রাখতে পারতেন?"

মোক্ষদা যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়া সামলাইয়া গেল—বলিল, "শুনেছি তাঁর কেউ নেই। আমি তাঁর দেশের লোক, সেইজন্তেই তোমায় বোর্ডিং হতে এনে এ বাড়ীতে রাখার ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসেন কিন্তু আমি—"

উর্ম্মি বাধা দিল, বলিল, "তুমি যখন তাঁর দেশের লোক, নিশ্চয়ই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো,—আজ তোমাকে সব কথা বলতেই হবে মাসীমা, যদি না বল—আমি আজ কিছু খাব না, উপোস করে থাকব। আর আমার জিদ তুমি তো জানো মাসীমা—"

শুষ্ক হাসিয়া মোক্ষদা বলিল, "জানি বই কি বাছা, আজ পাঁচ বছর তুমি আমার কাছে রয়েছো, আমি আর তোমাকে চিনব না?—তবে কর্ত্তার সম্বন্ধে তুমি যে জানতে চাচ্ছো, আমি বিশেষ কিছুই জানি নে। দেশের

লোক হলেই যে তার সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায়—তা নয়। মোটা-মুটি জানি—তোমার বাবা আফগানীস্থানে কাজ করে মোটা টাকা উপায় করেছেন—তা ছাড়া দেশেও পৈত্রিক সম্পত্তি আছে—"

উর্মি আবার বাধা দিল, বলিল, "দেশ কোথায় তাও তো আমি কোনদিন জানতে পারিনি মাসীমা।"—

মোক্ষদা উত্তর দিল, "সে অনেকদূর মা, ঢাকা জেলার একটা পাড়াগাঁ—তার নামটা কি লক্ষ্মীপুর না রুক্মিণীপুর—মনে ঠিক পড়ছে না।"

মোক্ষদা এ সব প্রশ্ন এড়াইতে চায়, উঠিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। রান্নাঘরে নাকি দুধ চাপানো আছে, বিন্দুঝির উপর দেখিবার ভার দিয়া আসিয়াছে, বিন্দু কি করিতেছে কে জানে।

শান্তকণ্ঠে উর্মি বলিল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি মাসীমা, তুমি এসব সম্পর্কে কোন কথা আমাকে বলবে না তাই নানাকথা বলে চাপা দিতে চাচ্ছো। আজ পাঁচ বছর আমি এ বাড়ীতে এসেছি,—পাঁচ বছরের মধ্যে আমি আমার পরিচয় কিছু পেলুম না।"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "যাঁকে আমার বাবা বলছো, তাঁকে আমি কোনদিন বাবা বলে ডাকিনি, তিনিও কোনদিন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি যাতে তাঁর প্রতি আমার এতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি আসে। তিনি যেমনভাবে আমায় এড়িয়ে গেছেন, আমিও ঠিক তেমনিভাবে তাঁকে এড়িয়ে গেছি, এই বাড়ীতে থেকেও আমরা অপরিচিতের মত দূরে দূরে চলেছি। যাক—তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চাইনে, আমার মায়ের কথা বল মাসীমা—তুমি নিশ্চয়ই আমার মাকে দেখেছ—?"

"তোমার মা—"

মোক্ষদার মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় না, মনে হইল তাহার কণ্ঠ হঠাৎ শুকাইয়া গেল।—উর্ম্মি সেদিকে লক্ষ্য করিল না, আপন মনেই বলিয়া চলিল, "হ্যাঁ, আমার মা। কতদিন আমি মায়ের কথা জানতে চেয়েছি, তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে চলেছো। আমি জানি—আমি শুনেছি—আমার মা সচ্চরিত্রা ছিলেন না, তবু আমি জানতে চাই—কারণ তিনি যাই হোন—আমার মা আমি অনেকবার তাঁকে ঘৃণা করতে চেয়েছি, মা নাম মুখেও আনিনি, তবু আজ একবার তাঁর কথা বল মাসীমা—আমায় একটিবার মাত্র জানাও আমার মা বেঁচে আছেন না মরেছেন।"

মোক্ষদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, খানিক চুপ ক... থাকিয়া বলিল "তোমার মা বেঁচে নেই উর্ম্মি, তুমি যখন শিশুমাত্র ত... তিনি মারা গেছেন।"

"সত্যি—সত্যি বলছো—"

উর্ম্মি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া মোক্ষদার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল,—"আঃ, বাঁচালে মাসীমা, আমাকে বাঁচালে। আমার মা মরেছেন, মরে আমায় মুক্তি দিয়েছেন, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।"

মোক্ষদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "শুনলেই যদি—সব কথা-গুলোই তোমায় বলি উর্ম্মি, না হলে তুমি তোমার বাবাকে চিনতে পারবে না। সত্যি কথা, আমি তোমায় এতদিন মিথ্যে কথাই বলে এসে..., কিন্তু আর মিথ্যে কথা বলব না—তোমায় বলার সময় হয়েছে বলেই স...ব"।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মোক্ষদা বলিল, "তোমার বাবার ...ল নাম অনাদি মিত্র নয়,—তাঁর নাম ধনপতি গাঙ্গুলী—"

"ধনপতি গাঙ্গুলী—"

উর্ম্মি চমকাইয়া উঠিল—

এ নাম সে শুনিয়াছে। ধনপতি গাঙ্গুলী কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দেশের অনেক সৎকাজ করিয়াছিলেন, কাছাকাছি চব্বিশ পরগণা জেলার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, শিকারে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার গল্প আজও লোকের মুখে শোনা যায়।

ব্যগ্রকণ্ঠে উর্ম্মি বলিল, "আমায় সব কথা বল এমন উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমি আমাকে রেখোনা—তোমার হাতে ধরছি মাসীমা—"

সে দুইহাতে মোক্ষদার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল।

মোক্ষদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সব কথাই বলছি উর্ম্মি—কোন কথাই গোপন করব না—শোন। তোমার বাবা ধনপতি গাঙ্গুলী চিরদিন এমন রুক্ষ, কোপন প্রকৃতির লোক ছিলেন না, একুশ বছর আগেকার সে ধনপতির সত্যই মৃত্যু হয়েছে,—এই অনাদি মিত্র তাঁরই ছায়ামাত্র। তিনি বলিতে লাগিলেন, উর্ম্মি নীরবে শুনিতেছিল—সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার ধনপতি গাঙ্গুলী,—শিকার ছিল তাঁহার জীবনে আনন্দের উৎস,—একমাত্র জীবনের উপলক্ষ্য, হয়তো শিকার করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন, কিন্তু হঠাৎ তিনিই বিবাহ করিয়া বসিলেন। দরিদ্রের একটী সুন্দরী মেয়েকে বিনাপণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালোওবাসিতেন, কোনদিন এতটুকু অবিশ্বাস করেন নাই।

তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল, ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি কোনখানের জমিদার ছিলেন তাহা মোক্ষদা জানে না। এই বন্ধু অবাধে অন্তঃপুরেও যাওয়া আসা করিতেন—বন্ধু বাড়ীতে না থাকিলেও তাঁহার ভিতরে যাওয়া স্থগিত হইত না।

ধনপতি শিকারোদ্দেশে দেশ বিদেশে ঘুরিতেন—এ নেশা তাঁহার

মোক্ষদার মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় না, মনে হইল তাহাঁর কণ্ঠ হঠাৎ শুকাইয়া গেল।—ঊর্মি সেদিকে লক্ষ্য করিল না, আপন মনেই বলিয়া চলিল, "হ্যাঁ, আমার মা। কতদিন আমি মায়ের কথা জানতে চেয়েছি, তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে চলেছো। আমি জানি—আমি শুনেছি—আমার মা সচ্চরিত্রা ছিলেন না, তবু আমি জানতে চাই—কারণ তিনি যাই হোন—আমার মা আমি অনেকবার তাঁকে ঘৃণা করতে চেয়েছি, মা নাম মুখেও আনিনি, তবু আজ একবার তাঁর কথা বল মাসীমা—অন্ততঃ একটিবার মাত্র জানাও আমার মা বেঁচে আছেন না মরেছেন।"

মোক্ষদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তোমার মা বেঁচে নেই ঊর্মি, তুমি যখন শিশুমাত্র তখন তিনি মারা গেছেন।"

"সত্যি—সত্যি বলছো—"

ঊর্মি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া মোক্ষদার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল,—"আঃ, বাঁচালে মাসীমা, আমাকে বাঁচালে। আমার মা মরেছেন, মরে আমায় মুক্তি দিয়েছেন, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।"

মোক্ষদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "শুনলেই যদি—সব কথা-গুলোই তোমায় বলি ঊর্মি, না হলে তুমি তোমার বাবাকে চিনতে পারবে না। সত্যি কথা, আমি তোমায় এতদিন মিথ্যে কথাই বলে এসেছি, কিন্তু আর মিথ্যে কথা বলব না—তোমায় বলার সময় হয়েছে বলেই সব বলব"।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মোক্ষদা বলিল, "তোমার বাবার আসল নাম অনাদি মিত্র নয়,—তাঁর নাম ধনপতি গাঙ্গুলী—"

"ধনপতি গাঙ্গুলী—"

ঊর্ম্মি চমকাইয়া উঠিল—

এ নাম সে শুনিয়াছে। ধনপতি গাঙ্গুলী কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দেশের অনেক সৎকাজ করিয়াছিলেন, কাছাকাছি চব্বিশ পরগণা জেলার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, শিকারে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার গল্প আজও লোকের মুখে শোনা যায়।

ব্যগ্রকণ্ঠে ঊর্ম্মি বলিল, "আমায় সব কথা বল এমন উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমি আমাকে রেখোনা—তোমার হাতে ধরছি মাসীমা—"

সে দুইহাতে মোক্ষদার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল।

মোক্ষদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সব কথাই বলছি ঊর্ম্মি—কোন কথাই গোপন করব না—শোন। তোমার বাবা ধনপতি গাঙ্গুলী চিরদিন এমন রুক্ষ, কোপন প্রকৃতির লোক ছিলেন না, একুশ বছর আগেকার সে ধনপতির সত্যই মৃত্যু হয়েছে,—এই অনাদি মিত্র তাঁরই ছায়ামাত্র। তিনি বলিতে লাগিলেন, ঊর্ম্মি নীরবে শুনিতেছিল—সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার ধনপতি গাঙ্গুলী,—শিকার ছিল তাঁহার জীবনে আনন্দের উৎস,—একমাত্র জীবনের উপলক্ষ্য, হয়তো শিকার করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন, কিন্তু হঠাৎ তিনিই বিবাহ করিয়া বসিলেন। দরিদ্রের একটী সুন্দরী মেয়েকে বিনাপণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালোওবাসিতেন, কোনদিন এতটুকু অবিশ্বাস করেন নাই।

তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল, ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি কোনখানের জমিদার ছিলেন তাহা মোক্ষদা জানে না। এই বন্ধু অবাধে অন্তঃপুরেও যাওয়া আসা করিতেন—বন্ধু বাড়ীতে না থাকিলেও তাঁহার ভিতরে যাওয়া স্থগিত হইত না।

ধনপতি শিকারোদ্দেশে দেশ বিদেশে ঘুরিতেন—এ নেশা তাঁহার

কোনদিন কমে নাই। বন্ধু চৌধুরীর উপর বাড়ীর ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি অন্য কোথাও যাওয়া আসা করিতেন। বন্ধু চৌধুরী যে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, স্ত্রী যে কোনদিন বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারে এ ধারণা কোনদিন তিনি করেন নাই।

একদিন নিতান্ত অসময়ে ফিরিয়া আসিয়া স্বচক্ষে যখন স্ত্রীর ব্যভিচারিতা, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করেন—এবং নিজেও পলাতক হন। তিনি চলিয়া যান সুদূর আফগানীস্থানে, তাঁহার শিশুকন্যাকে সেই রাত্রেই এক অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দেন—সে সেখানেই প্রতিপালিত হয়। বন্ধু চৌধুরীকেও তিনি হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

ঠিক যেন উপন্যাসের কাহিনী।

ঊর্ম্মি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল—তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার সেই চিত্র।

এই অনাদি মিত্র সেদিনকার ধনপতি গাঙ্গুলী, পত্নীর প্রতি কতখানি ভালোবাসা তাঁহার অন্তরে ছিল, শিশুকন্যার প্রতি কতখানি স্নেহ তাঁহার মনে ছিল, আজ তাঁহাকে দেখিয়া কেহই তাহা বুঝিবে না। এই রুক্ষ-মূর্ত্তি কঠোর ভাষি মানুষটী এত কাছে থাকিয়া ঊর্ম্মি তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, এতটুকু ভালোবাসিতে পারে নাই।

কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে আসে—ঊর্ম্মি তাহাই ভাবে। অকস্মাৎ এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি রুক্ষমূর্ত্তি মানুষটীর প্রতি সে করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার মা—তাহার হতভাগিনী মা—

উর্ম্মি দুই হাতে মুখ ঢাকিল,—

আজ মনে জাগিল পিতার সেই কথা—আঁস্তাকুড়ের পাত কখনও স্বর্গে যায় না। কেন তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, সেদিন না বুঝিলেও আজ উর্ম্মি তাহা বুঝিল। সমগ্র নারী জাতির উপর তাঁহার যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, উর্ম্মিও তাহা পাইয়াছে। সে ফিলমে যোগদান করিলে পিতা যে পত্রখানা তাহাকে লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতি লাইনে তাঁহার বিক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে,—তিনি কতখানি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহা সে পত্র পড়িলে বুঝা যায়।

উর্ম্মি যখন মোক্ষদাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া মুখ হইতে হাত সরাইল, তাহার অনেক আগে মোক্ষদা সরিয়া গিয়াছে। সে রন্ধন গৃহে যায় নাই—সিঁড়ির নীচে নির্জ্জন কুঠরীটায় বসিয়া নিঃশব্দে প্রবহমান অশ্রুধারা মুছিতেছে।

১৬

ম্যানেজার অমূল্য জয়ন্তকে সুচোখে দেখিতে পারে নাই।

প্রথম দিন এই লোকটাই যে তাহাকে অপমান করিয়াছিল সে অপমানের জ্বালা অমূল্য ভুলিতে পারে নাই। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যাইতে যাইতে বৎসরও ঘুরিতে চলিল, জয়ন্ত অমূল্যের ঘৃণা অবজ্ঞা কুড়াইয়া এখানেই রহিয়া গেল।

অমূল্য যখনই কলিকাতার পত্র পায় ভবেশ চৌধুরী জয়ন্তের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লেখেন, পত্র পড়িয়া অমূল্যের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়।

সম্প্রতি সে ভবেশ চৌধুরীর কাছে সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া

মিলাকে বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল, ভবেশ চৌধুরী জানাইয়াছেন—মিলার শরীর কিছু অসুস্থ যাইতেছে, কয়েকদিন পরে সে তাহার মত তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছে। তাঁহার নিজের তরফ হইতে কোনও আপত্তি নাই, একথা তিনি আজও বলিতেছেন।

কয়েকদিন পরে—

অমূল্যের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জলিয়া যাইতেছিল কয়েকদিন পরে —কেন? মিলা তাহার বাক্‌দত্তা স্ত্রী, ভবেশ চৌধুরী তাহাকে উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া নিজের ব্যয় তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। অমূল্য তাঁহার দানের মর্য্যাদা রাখিয়াছে—সে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, বিলাতেও যথেষ্ট নাম রাখিয়াছে।

দরিদ্রের সন্তান সে ছিল না, তাহার পিতা ভবেশ চৌধুরীর বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন জানা যায় তিনি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন—তাহার সবই ঋণদায়ে বন্ধক রহিয়াছে। মৃত্যুকালে ভবেশ চৌধুরীকে সমস্ত কথা বলিয়া পুত্রকে তিনি তাঁহার হাতে দিয়া যান।

তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যদি অমূল্য ভালো হয়, তিনি তাহার সহিত মিলার বিবাহ দিবেন, তাহার রুচি অনুযায়ী তিনি মিলাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অমূল্যের ইচ্ছা ছিল মিলা সর্ব্বাংশে আধুনিক ধারায় শিক্ষিতা হয়,—মিলাও তাহাই চাহিয়াছিল। মনে আঘাত লাগিলেও ইহাদের জীবনধারার দিকে চাহিয়া ভবেশ চৌধুরী বাধা দেন নাই

, আজ অমূল্যের সেদিনকার কথা মনে পড়ে—মাত্র তিন বৎসর আগেকার কথা—যেদিন সে বিলাত হইতে আসিয়া পৌছাইল, সকলের

আগে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল হাস্যমুখী মিলা। সেদিন মিলার পানে চাহিয়া অমূল্যের মনে হইয়াছিল সে সুখী হইবে।

ভবেশ চৌধুরীর স্থাপিত জুটমিলে প্রথমে সে কাজ লইয়াছিল, কিন্তু তাহার উদ্ধত আচরণে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করায় অন্য অংশীদারেরা তাহাকে ম্যানেজার পদে রাখিতে আপত্তি করেন, বাধ্য হইয়া ভবেশ চৌধুরী তাহাকে সে পদ হইতে অপসৃত করিয়া নিজের জমিদারীর ম্যানেজারের পদ দেন।

তিনি নিজে জমিদারীর কোন কাজ দেখিবার সময় পাইতেন না, নানা প্রতিষ্ঠান—বিশেষ করিয়া জুটমিলটী লইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত, এজন্য বরাবরই জমিদারীতে ম্যানেজার থাকিতেন। প্রজারা জমিদারকে চিনিত না, ম্যানেজারকেই জমিদার বলিয়া চিনিত।

অমূল্য প্রবল প্রতাপে জমিদারী শাসন করিত—প্রজাদের কোন আবেদন জমিদারের নিকট গিয়া পৌঁছাইতে পারিত না, কোন রকমে কেহ বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত পৌঁছাইলেও দ্বারোয়ানের হাত ছাড়াইয়া ভিতরে যাইতে পারে নাই।

ভবেশ চৌধুরী এখানে যে মাসখানেক ছিলেন এই একমাস অমূল্য নিয়ত তাঁহাকে নিজের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ ভবেশ চৌধুরীর নিকট যাইতে পারে নাই।

প্রজারা অমূল্যকে ভয় করিত, আন্তরিক ঘৃণা করিত—অমূল্যকে তাহারা এড়াইয়া চলিতে পারিলে বাঁচিত।

নিজে একদিন দারিদ্র্য কষ্ট সহ্য করিয়াছে বলিয়াই অমূল্য দরিদ্রদের ঘৃণা করিত, নিজের সেদিনকার কথা সে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারিত যদি ইহারা তাহার চোখের সামনে বর্ত্তমান না থাকিত।

অমূল্য মিলাকে ভালোবাসে ;—বিলাতে তিন বৎসর সে মিলাকেই ভাবিয়াছে। মিলা তাহাকে জানাইয়াছিল সে বি, এ, পাশ করিতে পারিলে বিবাহ করিবে—কিন্তু বি. এ, ডিগ্রি লাভ করিয়াছে সে বিবাহ করিতে তেমন ইচ্ছুক নয় কেন ?

ইহার মূলে জয়ন্ত নাই তো—? এই একটা চিন্তা জাগিয়া অমূল্যকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

কয়েকমাস আগেকার একটী দিনের কথা মনে পড়ে—সেদিন মিলা তাহাকে বাহির হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। জয়ন্তের পানে সে একবার চাহিয়াছিল—সে দৃষ্টিতে ছিল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা—। সেই মুহূর্ত্তে মিলা তাহার পানে তাকাইয়াছিল, সে দৃষ্টিতে ছিল তাচ্ছিল্য—অবহেলা।

অমূল্যের রক্ত গরম হইয়া উঠে।

জয়ন্ত সুশ্রী এ কথা অমূল্য স্বীকার করে, কিন্তু মাকাল ফলও তো সুশ্রী, তাহার রূপের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে দুনিয়ার কদর্য্যতা, যাহা মানুষের অন্তরকে ঘৃণায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। জয়ন্তের রূপ ছাড়া আর কোন গুণ নাই,—দরিদ্র ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া কোনও টোলে বা চতুষ্পাটি পর্য্যন্ত,—সেখানে কেবল পূজার মন্ত্রের উচ্চারণাদি শিখানো হয় মাত্র। কাজের মধ্যে শিখিয়াছে পূজা করা আর গুণ্ডামি, আর কিছু নয়।

এই জয়ন্তকে মিলার মত মেয়ে ভালোবাসিতে পারে, কথাটা মনে করিতেও হাসি পায়। মিলা—উচ্চ-শিক্ষিতা, সুন্দরী—তাহার পিতা কোটিপতি জমিদার, পাশ্চাত্যের আবহাওয়ায় সে প্রতিপালিতা, পূজার্চ্চনা ঠাকুর দেবতা কোনদিন সে মানে নাই,—আজ সে ভালোবাসিবে

কুসংস্কারান্ধ এই পূজারী ব্রাহ্মণকে, যে ভিক্ষা করিয়া নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করে ?

সেদিন পথ দিয়া আসিতে মন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ তাহাকে আকৃষ্ট করিল। তিন বৎসরের মধ্যে তিনদিনও অমূল্য মন্দিরে আসিয়াছে কি না সন্দেহ,—আজও প্রবেশ করিত না—কেবল জয়ন্তের জন্যই সে মন্দিরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে,—খানিক পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিবে, এখন পথ ঘাট অন্ধকারে ঢাকা। পূর্ব্বদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, চাঁদ উঠিলে চারিদিক আলোয় ভরিয়া যাইবে।

পথের ধারে কোথায় ফুটিয়াছে হেনা ফুল, সুন্দর গন্ধে চারিদিক পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মন্দিরের কাছাকাছি আসিতে গন্ধরাজের এক ঝলক গন্ধ একটা দমকা বাতাসে বহিয়া আনিল।

অনেক দূরে কোথায় কে গান ধরিয়াছিল—

ভবের খেলা সাঙ্গ হবে—
আকুল আমি ভেবে ভেবে।

অমূল্য হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—

শান্ত সন্ধ্যার বুকে লুকানো ও গভীর প্রশান্তভাব কেমন যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল,—কোনদিন যাহা সে করে নাই, আজ সে তাহাই করিল মুহূর্ত্তের জন্য সে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

এই শান্ত বাতাস মনের মধ্যে বহিয়া আনিল গভীর প্রশান্তি, ওই গানের সুরে এখানে—এই পথের উপরই অমূল্যের চোখের পাতা হঠাৎ মুদিয়া আসে—তাহার ঘুম পায়, স্বপ্ন চালিতের মত অমূল্য এক পা এক পা করিয়া চলিতে থাকে।

"এই যে ম্যানেজার বাবু—"

কথাটা কাণে আসিবামাত্র অমূল্যের তন্দ্রালুভাবটা হঠাৎ টুটিয়া গেল,—অৰ্দ্ধ-নিমীলিত চোখ সম্পূর্ণভাবে মেলিয়া সে তাকাইল।

"ষ্টুপিড—রাবিশ—"

দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য সে পা বাড়াইতে যদুনাথ বাধা দিলেন, "আমি আপনার কাছেই গিয়েছিলুম ম্যানেজার বাবু, এদিকে এসেছেন শুনে আসছি। আপনার কাছে একটা দরকার আছে।"

অমূল্য দাঁড়াইল, বলিল, "কি এমন দরকার আছে যে আপনি আমাকে এত খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আমি এখন কোন কথা শুনতে পারব না নায়েব মশাই, আপনার যা কিছু দরকার আছে তা কাল কাছারীতে আমায় জানাবেন।"

সে অগ্রসর হইল।

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে যদুনাথ বলিলেন, "কিন্তু আজই যে কথাটা আপনার শুনতে হবে ম্যানেজার বাবু, কাল কাছারীতে করতে হবে মীমাংসা, আজ শুনে ঠিক না করে রাখলে কাল বুঝবেন কি করে? কর্ত্তাবাবু তো রাজার মত হুকুম দিয়ে চলে গেছেন—এদিকে যে তাল সামলাতে প্রাণ যায় আমাদের, তাতো ভাবছেন না।"

উৎসুক হইয়া অমূল্য বলিল, "কি ব্যাপার ঘটেছে বলুন দেখি?"

মন্দিরে দ্বারের বাহিরে দুইদিকে বসিবার মত গাঁথা স্থান ছিল অমূল্য তাহারই একটাতে বসিল, যদুনাথ অন্যটীতে বসিলেন।

যদুনাথ বলিলেন, "কথাটা হচ্ছে আমাদের নূতন পুরোহিত জয়ন্তের

ভিটে নিয়ে। কর্ত্তাবাবু তার জিনিষ তাকেই ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে জমি আমরা খাসে নিয়ে পত্তনবিলি করে দিয়েছি আজ বারোবছর গোবিন্দ আচার্য্যি সে জমির মালিক। বারো বছরে তার দখলীস্বত্ব সর্ত্ত জন্মে গেছে, এখন অমনি চট করে তাকে বাতিল করা সম্ভব হবে কি ?"

জয়ন্তের প্রসঙ্গে অমূল্যের সকল জড়তা ও বিরক্তি নিমেষে দূর হইয়া গেল, উৎসাহিতভাবে বলিল, "আমি তো এ সব কিছুই জানিনে,—এই রকম ব্যাপার ঘটেছে নাকি ?"

যদুনাথ উত্তর দিলেন, "তা নইলে আপনার জন্তে আজ এই বুড়ো বয়সে দৌড়াদৌড়ি করছি কেন বলুন। জয়ন্ত তো হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে নিজের জমি ফিরিয়ে নেওয়ার হুকুম আদায় করে নিলে, অথচ বারোবছর ধরে সে জমি অন্য লোকে দখল করেছে তা তো কেউ জানলে না। এখন আমাদের উপায় কি হতে পারে ভাবুন ?"

শক্তভাবে অমূল্য বলিল, "তিনি এ সব কথা জানতেন না, কারণ নামে মাত্র জমিদার হলেও তিনি জমিজমার কিছু কোনদিন করেন নি —কিছু বোঝেন না। তিনি না জেনে একটা হুকুম দিয়েছেন, আমরা জেনে সেটা যাতে বাঁচাতে পারি তা করব।"

যদুনাথ খুসি হইয়া বলিলেন, "তারপর আর আছে—বুড়ো হেম ভট্টাচায্যিকে মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবার কথা ঠিক করে কর্ত্তা-বাবু তাঁকে ছাড়িয়ে জয়ন্তকে আবার নূতন করে কাজে নিলেন। এ কথাটা একবার ভাবলেন না—জয়ন্ত জোয়ান ছেলে, মুটে মজুরের কাজ করেও দিন চালাতে পারবে। একটা পেট বইতো নয়, যেমন করে হোক কেটে যাবে, কিন্তু হেম ভশ্চায্যের দুটী ছেলে, তিনটী মেয়ে, স্ত্রী,

পুত্রবধূ,—সকলের বাঁচবার উপায় ছিল এই কাজটা,—এতেই তাঁরা খেয়ে পরে বাঁচতেন। মন্দিরের আয় তো বড় কম নয়—জমিদার সরকার হতে পূজার জন্যে মাসে পঁচিশ টাকা তো আছেই, তা ছাড়া রোজ এতলোকের প্রণামী এক একটা করে পয়সা জমতে জমতে কোন না দিন দুটো করে টাকা হয়। তারপর গাঁয়ের এত লোক আছে তাদের বারো মাসে তেরো পার্ব্বন তো লেগেই আছে, তাতে নৈবেদ্য বড়তো কম পাওয়া যায় না। বুঝুন—তাতে করে অতবড় সংসারটা চলতো, আর জয়ন্ত তো একলা মানুষ, দুবেলা কতই বা খায়।"

অমূল্য মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এই সব নৈবেদ্যের চাল জয়ন্ত কি করে?"

"কি করে—"

যদুনাথের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল—"সে কথাও আপনাকে বলতে হবে ম্যানেজার বাবু?"

অমূল্য বলিল,—"কিন্তু এতো একেবারে অবৈধ—আইন-বিরুদ্ধ—"

যদুনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"অবৈধ—আইন বিরুদ্ধ? আইন বিরুদ্ধ তো অনেক কিছুই আছে ম্যানেজার বাবু, কয়জন লোক আইন বাঁচিয়ে কাজ করতে পারে—বিশেষ এই ধরণের গরীব লোকেরা, এরা যা দু পয়সা পায়—তাই এদের লাভ। এর বাপ দীনু এই মন্দিরের কাজ করে হাজার দু তিনটাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছিল, দেশের আর কেউ এ কথা জানে না কিন্তু আমি সব জানি, আমাকে কোন কথা সে লুকাত না। সেই টাকাতেই না কলকাতায় এতকাল বাসাভাড়া চালিয়েছে, খাওয়া পরা চালিয়েছে, টাকা না থাকলে কি এ সব হতো? এই যে

জয়ন্ত—এও বড় কম টাকাটা চুপে চুপে জমাচ্ছে না, এই সব চাল, অন্য অন্য জিনিস পত্র বিক্রি করে।"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "বেআইনী কাজ ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড দেওয়া চলে,—কিন্তু ধরা যাবে কি করে—পারবেন ধরিয়ে দিতে? এমন কোন লোককে আনতে পারবেন যে বলতে পারবে জয়ন্ত তার কাছে কিছু বিক্রি করেছে?"

যদুনাথ মাথা নাড়িলেন—"ভারি মুস্কিল ম্যানেজার বাবু এই আট নয় মাসের মধ্যে জয়ন্ত বেশ একটা দল গড়ে তুলেছে,—তারাই জয়ন্তের দ্বারা উপকৃত হয়। যত ছোটলোকেরা গাঁয়ে—আর আশপাশে আছে তারাই কম দামে চাল কিনে নিয়ে যায়, জিজ্ঞেস করলে বলে—পুরুত ঠাকুর প্রতিদিন তাদের চাল বিলায়। কিন্তু আমি বলছি ম্যানেজার বাবু, এ সব মিথ্যে কথা, তারা অর্দ্ধেক দামে এ সব পায় তাই ওর বিপক্ষে কোন কথা বলে না—হয়তো বলবেও না।"

অমূল্য গর্জ্জিয়া উঠিল, "না, বলবে না বই কি, চাবুক দিয়ে তাদের সত্যি কথা বলতে আমি স্বীকার করাব। আপনি কাল সকালে এ রকম দু চারজন লোককে আমার কাছে আনবেন নায়েব মশাই, আমি তাদের কাছ হতে প্রমাণ নিয়ে তারপরে আমি জয়ন্তকে একবার দেখে নেব।"

অমূল্য দাঁতের উপর দাঁত রাখিল—

সত্যই জয়ন্তকে সে একবার দেখিয়া লইবে। অমূল্য সুশ্রীলোকদের ঘৃণা করে—বিশেষ করিয়া জয়ন্তকে। নিজে সে রূপবান নয়—সেজন্য ভগবানের উপর তাহার আক্রোশের শেষ নাই। যদিও সে ভগবানকে মানে না, বিশ্বাস করে না, তথাপি তর্কের মুখে বলে, যদি সে সেই

অদৃশ্য ভগবানকে একটীবার দেখিতে পাইত সে তাহাকে চাবকাইয়া ঠিক করিয়া দিত।

দরিদ্র জয়ন্ত, ভিখারী জয়ন্ত, তাহার সৌন্দর্য্য অবৈধ্য—একেবারেই আইন বিগর্হিত। তাহার হওয়া উচিত ছিল কুৎসিত দর্শন, লোকের করুণামিশ্রিত চাহনীই, সে কেন লাভ করে প্রশংসাপূর্ণ চাহনী নয়।

জয়ন্তকে অমূল্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, তাহার স্পর্দ্ধা, তাহার সৌন্দর্য্য তাহাকে পদে পদে আহত করিতেছে, যেমন করিয়াই হোক ইহাকে এখান হইতে দূর করিতেই হইবে।

অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথও দাঁড়াইলেন—তখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে, অমূল্য অগ্রসর হইল, যদুনাথও তাহার সহিত চলিলেন।

"বুঝলেন ম্যানেজার বাবু,—আমি আর বাড়ীতে রেখে তাকে সংযত করতে চেয়েছিলুম, আমার বাড়ীতে না থেকে এলো কি না মন্দিরে। জানি—ওর বাপ চিরটাকাল শত্রুতা করেছিল, তার ছেলে ও কি তা না করে ছাড়বে? সেই রক্ত ধারাই বইছে তো এরও দেহে—শত্রুতা করতে এই কি ছাড়বে?"

চলিতে চলিতে অমূল্য কেবল মাত্র বলিল, "হুঁ"—

জয়ন্তের উপর দারুণ জীঘাংসাবৃত্তি যদি না জাগিত, অমূল্য নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত যদুনাথের এ সব কথা সত্য কি না।

হন হন করিয়া পিছনে কে আসিয়া পড়িল, চাঁদের আলো তখন শাস্তুগ্রামের বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসাইয়া তুলিয়াছে।

পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে অমূল্য মুখ ফিরাইল—পিছনে আসিয়া

পড়িয়াছে জয়ন্ত। মালকোঁচা দিয়া কাপড়খানা পরা, গায়ে একখানা চাদর জড়ানো, হাতে একটা তেলপাকানো পুরা পাঁচহাত লাঠি।

যদুনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবাজি যে—"

জয়ন্ত সহাস্য মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বটে। নমস্কার ম্যানেজার বাবু—"

অমূল্য হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া গেল।—

উজ্জ্বল শুভ্র চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে জয়ন্তের শুভ্র সুন্দর দেহের উপরে—তাহাকে দেখাইতেছিল যেন সত্যই মহাদেবের মত—যেমন ছবিতে দেখা যায়। অমূল্য তাহার দিকে তাকাইয়া চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

যদুনাথ বলিলেন, "এইমাত্র আরতি শেষ করলে—এর মধ্যে আবার হন হন করে ছুটেছো কোথায়?"

জয়ন্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যাচ্ছি একবার বাগ্দীপাড়ার দিকে; রামলোচনের বড় অসুখ করেছে, রাত্রে হয়তো সেখানে থাকতেও হবে—"

আশ্চর্য্য হইয়া অমূল্য বলিল, "রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে—বাগ্দীবাড়ীতে—কেন ওদের কেউ নেই?"

শান্তভাবে জয়ন্ত বলিল, "থাকলেই বা কি,—সে বরং থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। তার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে সবাই আছে,—কিন্তু তারা কি রোগীর সেবা করতে জানে—না দেখতে জানে। ওদের হাতে একটা দিন ওই রোগী থাকলে বাঁচতে হবে না সে জানা কথা।"

সে দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল,—"নমস্কার ম্যানেজার বাবু, আর দেরী করলে চলবে না,—সে বেচারার এতক্ষণ কি অবস্থা হয়েছে তার ঠিক নেই।"

সে আবার হন হন করিয়া চলিল।

একটা বাঁকের মুখে অবিলম্বে সে মিলাইয়া গেল। যদুনাথ বলিলেন, "দেখলেন ম্যানেজার বাবু, এরই হাতে জমিদার বাবু মন্দিরের ভার, ঠাকুরের ভার দিয়ে গেছেন। যে সমস্ত রাত বাগ্দীপাড়ায়, মুচি পাড়ায় কাটিয়ে আসে,—সকাল বেলায় একটা ডুব দিয়ে আবার পূজা করতে বসে,—সেই দেয় লোককে ঠাকুরের চরণামৃত, দেবতার নির্ম্মাল্য। এরকম ভাবে পূজা করার চেয়ে ঠাকুর এমনই পড়ে থাকাও ভাল।"

অধৈর্য্যভাবে অমূল্য বলিল, "যাক ওসব কথা, আপনি এখন বাড়ী যান চক্রবর্ত্তি মশাই, আমি খানিকটা বিশ্রাম করতে চাই; আমি এখন ভারি ক্লান্ত।"

পার্শ্বেই ম্যানেজারের অট্টালিকা; অমূল্য আর একটী কথা না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, যদুনাথ নির্ব্বাক খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইল।

অমূল্য যে জয়ন্তকে ঘৃণা করে—জয়ন্ত তাহা কেয়ারেই আনে না, নিজের যেখানে সে থাকে,—নিজের কাজ একান্ত নিষ্ঠার সহিত সফল করিয়া যায়।

ভদ্রলোকেরা পিছনে নিন্দা করেন, সকলে কেহই কোন কথা বলিতে পারেন না, জয়ন্ত সামনে আসিলেই তাঁহারা সকল ভাষা হারাইয়া ফেলেন। ছোটলোকেরা জয়ন্তকে মানে, ভক্তি শ্রদ্ধা করে।—

বেচারারা—

ইহারা কোথায় পড়িয়া আছে, কত নির্য্যাতনই না সহিয়া যায়।

জয়ন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করে বর্ত্তমানে আর সেদিন নাই, যে কেহ পদাঘাত করিলেও মাথা পাতিয়া সহিয়া যাইতে হইবে। আঘাতের ফলে প্রতিঘাত করিবার শক্তি যখন সকলেরই আছে, কেন তাহারা সহ্য করিবে, কেন ধনীর পদতলে পিষ্ট হইয়া মরিবে?

জয়ন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করে—ভগবান এক, এবং তিনি একই মানুষ-জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, বড় বা ছোট বলিয়া কেহ নাই—কিছু নাই। সুখ দুঃখ, বেদনা আনন্দ অনুভব করিবার শক্তি যখন সকলেরই আছে, কেন অর্দ্ধেকের বেশী লোক এমন নিষ্ঠুরভাবে অবহেলিত জীবন কাটাইবে?

কিন্তু কেহ বুঝিতে চায় না।

চিরকাল ইহারা জানে—তাহাদের স্থান অনেক পিছনে, তাহাদের জগৎ আলাদা অন্ত্যজ চিরদিন অন্ত্যজ হইয়াই থাকিবে তাহারা বরাবর

ইহাই জানে। আজ জয়ন্ত তাহাদের মজ্জাগত সংস্কার ধরিয়া নাড়া দিয়াছে, তাহাতে তাহারা সচকিত, ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

লোচন মণ্ডল বলিয়া বসিল, "সে কি হয় ঠাকুর, আমরা চিরদিনের ছোটলোক, চিরদিন ছোটলোক হয়েই থাকব, ভদ্রলোক হতে পারব না—ঠাকুর পূজোর অধিকারও কোনদিন পাব না। অনর্থক কেবল একটা দলাদলি করে—"

জয়ন্ত উষ্ণ হইয়া বলিল, "আগে আমাকে বুঝাও লোচন—ভদ্রলোক কাকে বলে? যারা লেখাপড়া শিখেছে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি ঘরে জন্মেছে তারাই পাবে পূজার অধিকার—তোমরা কেন পাবে না? যে ভগবানকে ওরা ডাকে, পূজো করে, তোমরা কি তাঁকেই ডাকো না?

লোচন মণ্ডল চট করিয়া জয়ন্তের পায়ের ধূলা মাথায় দিল, অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, "মাপ করুন ঠাকুর মশাই, এ রকম কিছু করতে গেলে আমাদের আর একটী দিন গাঁয়ে থাকতে হবে না, আমাদের ঘর জ্বালিয়ে বিদায় করবেন এই সব ভদ্রলোকেরা। তার চেয়ে আমরা যেমন আছি তেমনি থাকতে দিন—এমনি করে খেটে খুটে আমরা দিন কাটাই।"

জয়ন্ত ইহাদের এ ভাবে তুলিবার আশা ছাড়িয়া দিল।

সে প্রস্তাব করিল ইহাদের ঘরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সে পড়াইবে।

সঙ্কুচিত ছোটলোকেরা বলিল, "লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে ঠাকুর মশাই? ছোটলোকদের ছেলে—তবু লেখাপড়া না শিখে আছে ভালো, লেখাপড়া শিখলে কি এরকম থাকবে, এসব কাজ কর্ম্ম করবে?"

জয়ন্ত হাসিল, বলিল, "ক'রবে নাই বা কেন—ছোটলোকেরা কি

লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় না, না তারা কোন কাজ করে না? বরং তারা আরও সুন্দরভাবে কাজ করে, এরপর তোমরা দেখে বুঝতে পারবে।

ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন সুবিধাজনক নয় বলিয়াই জয়ন্ত পার্শ্বে অবস্থিত নিমাই দাসের বাড়ীতে শিক্ষার স্থান ঠিক করিল।

ছেলেমেয়েরা মহোৎসাহে বই শ্লেট লইয়া আসিতে লাগিল, জয়ন্ত তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা বাধা দিলেন—

একদিন জয়ন্তকে ডাকিয়া তাঁহারা বুঝাইলেন,—"এ সব কি ব্যাপার হচ্ছে ঠাকুর, এই সব ছোটলোকদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি লাভ হবে;—এরা চাকরী করবে না পূজোর কাজ করবে?"

জয়ন্ত বলিল, "সামান্য কিছু শিখে রাখলে ওদের যথেষ্ট উপকার হবে, অনেক কিছু বুঝে নিতে পারবে, তাতে ওদেরও ভালো, আর সকলেরও ভালো হবে।"

ভদ্রলোকেরা হাসিলেন, বলিলেন, "দেখো ঠাকুর—দেশটাকে যেন নবদ্বীপ ভাটপাড়া বা শান্তিপুরের মত পণ্ডিতে ভর্তি কোরো না, এর পরে ওদের ঠেলা সামলাতে আমাদের প্রাণ যাবে। কোনও দিন হয়তো বলে বসবে আমরাই ঠাকুর পূজো করব, মন্ত্র আমরাও জানি—'

বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "যদিই তা করতে চায়—সেটা তো এমন কিছু মহাপাপ নয়—"

"মহাপাপ নয়—"

ভদ্রলোকেরা দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—"মহাপাপ তবে কাহাকে বলে শুনি? মুচি, হাড়ি, ধোপা কুমোর এমনি আর যত নীচ

জাত—যাদের কোনকালে জল চলে নি,—কোনকালে যারা পাশে দাঁড়ানোর অধিকারও পায়নি, তারাই আসবে ঠাকুর পূজো করতে,—তাই বুঝি তুমি করতে চাও?"

জয়ন্তের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কি একটা কথা তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে তাহা সামলাইয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি বলছি—যদি সত্যিই তারা পূজোর অধিকার পায়—সেটা মহাপাপ নয়, বরং সেটা তাদের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য পাওনা। দেবতাকে বিশ্ব হতে সঙ্কুচিত করে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে,—কেবল মাত্র ব্রাহ্মণকে পূজার অধিকার দিয়ে দেবতাকে বিশেষ সম্মানের পাত্র করেন নি, দেবতাকে আরো নামিয়ে এনেছেন। অবিশ্যি আমি এ কথা বলছিনে—লেখাপড়া শিখে তারা পূজা করতে আগেই মন্দিরে ঢুকবে,—দেশ একেবারে পণ্ডিতে ভরে যাবে আপনাদের এ ধারণা মিথ্যে—আমি বার বার আপনাদের এ কথা জানিয়ে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোকেরা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিলেন।

জয়ন্তের ইহাতে কিছুই ক্ষতি হইল না, সে নবোৎসাহে পড়াইতে লাগিল।—

সেদিন যদুনাথ নিজে তাহাকে বুঝাইতে আসিলেন, "এ সব কি করছো বাবাজি, কেন এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনছো? এই সব ছোটলোকেরা এমনিতেই আমাদের গ্রাহ্য করে না, তার ওপর যদি এরা লেখাপড়া শেখে তা হলে আর আমাদের এখানে টিকতে হবে না।"

জয়ন্ত তখন কেবল মাত্র বই খুলিয়া বসিয়াছিল, আশে পাশে দু'

বারোটী ছেলে মেয়ে চেটাই পাতিয়া বসিয়া পড়া করিতেছিল। যদুনাথের কথা শুনিয়া বই মুড়িয়া জয়ন্ত কেবল হাসিল।

তাহার সে হাসি যদুনাথকে বিলক্ষণ বিরক্ত করিয়া তুলিল, তিনি কুঞ্চিত মুখে বলিলেন, "সব কথাই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না বাবাজি তলিয়ে সব কিছু বুঝে কাজ করলে লোকের কথা শুনতে হয় না। তোমার বাবা কতকাল কাজ করেছেন, কেউ তাঁকে একটা কথা বলতে পারে নি।"

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "বলে নি কিন্তু তবু তাঁকে অপমানিত ভাবে এতটুকু ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সব ফেলে রেখে চলে যেতে হয়েছিল শুনেছি—"

যদুনাথ বলিলেন, "সে অন্য কোন কারণে নয়, মনিবের সঙ্গে অমন উদ্ধতভাবে কথা বললে মনিব তা সহ্য করবেন কেন, কাজেই তাঁকে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তুমি আর কতটুকু জানো বাবাজি, তোমার বাবা আমার নিজের ভাইয়ের মতই ছিলেন, তাঁর কোন কথা আমার কাছে লুকাবার ছিল না, আমার কোন কথাও লুকাবার মত ছিল না। দেশের কেউ অনেক সময় বুঝতে পর্য্যন্ত পারতো না তিনি আমার নিজের ভাই ছিলেন কি না। সেদিনকার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি বাবাজি, মনে হচ্ছে—যেন সেদিনকার কথা—"

জয়ন্ত কথা বলিল না, চুপ করিয়া বইখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

এই সব লোকদের চিনিতে তাহার বাকি নাই, এক বৎসরে সে সকলকে চিনিয়াছে এক বৎসর আগে জয়ন্ত মানুষ চিনিত না।

যে কয়দিন যদুনাথের বাড়ীতে সে ছিল—কেবল তাঁহার স্ত্রীর একান্ত সত্য আগ্রহের জন্য, নচেৎ একদিনও সে থাকিত না। এই লোকটীর মুখে এক কথা, অন্তরে একেবারে ভিন্নরূপ, মানুষ যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহুরূপীর

মত রূপ বদল করিতে পারে তাহার পরিচয় প্রথম সে এখানেই পাইয়াছে।

যদুনাথের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া পর্য্যন্ত জয়ন্ত যদুনাথকে ঘৃণা করে, মুখে সে ঘৃণা প্রকাশ করে নাই, এইটুকু কপটতা সে এখানে এই সব লোকের নিকট হইতে শিখিয়াছে।

যদুনাথ ছেলেমেয়েগুলোকে লাঠি লইয়া তাড়া করিলেন—"যা যা লেখাপড়া করতে হবে না, লেখাপড়া শিখে সব যেন চাকরী করে খাবে পাজী সব, আর কোনদিন বই নিয়ে এলে লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেব—

বই শ্লেট ফেলিয়া ছাত্র ছাত্রীরা পালাইল—

জয়ন্ত বলিল, "ও বেচারাদের অনর্থক নির্য্যাতন করছেন ওদের কোন দোষ নেই, দোষ আমার, কারণ আমিই ওদের যে পড়তে নিয়ে এসেছি।"

যদুনাথ বলিলেন, "আর এদিকে যে তুমুল কাণ্ড বেধেছে বাবাজি, সে সব কোন খবর তো রাখো না। আমি নেহাৎ দীনুকে ভাইয়ের মত দেখতুম, তুমি সে কথা স্বীকার কর আর নাই কর—তার জন্যেই তোমার ভালো যাতে হয় সে চেষ্টাও করি। বামুনের ছেলে তার ওপরে মন্দিরের পূজারি তুমি, দিনরাত এই সব ছোটলোকের সঙ্গে মিশলে লোকে দু-কথা বলবে নাই বা কেন? তুমি বামুনের ছেলে, কোথায় এই সব ছোট লোকেরা তোমার ছায়াকে পর্য্যন্ত প্রণাম করবে, তা না করে এখন কি না—"

ক্রোধে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাকৃত ব্রহ্মণ্যের অবমাননা তাঁহাকে পীড়িত ও ব্যথিত করিয়াছিল বড় কম নয়।

জয়ন্ত সোজা হইয়া বসিল, বলিল, ব্রাহ্মণের সে গৌরব যে ব্রাহ্মণই ঘুচিয়েছে চক্রবর্ত্তী মশাই। যে ব্রাহ্মণ একদিন বিশ্বের প্রণাম গ্রহণ

করেছে, আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ করেছে সে ব্রাহ্মণ আজ কোথায় আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করি? একদিন ব্রাহ্মণের একটী কথায় রাজার রাজত্ব চলে যেতো, পথের ভিক্ষুক রাজা হতো, সে ব্রাহ্মণ আজ কই?

ব্রাহ্মণ আজ ধাপে ধাপে নামতে নামতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ভাবুন দেখি। আজ ব্রাহ্মণের চোখে সে আগুণ নেই, ব্রাহ্মণের কণ্ঠে সে শক্তিময় বাণী নেই, তবু নির্ব্বিষ সাপের মত সে পড়ে রয়েছে খোলসের মত পৈতেটাকে অতীতের সাক্ষী রেখে। মিথ্যাবাদী, চোর ভণ্ড সে,—নবগুণের একটী গুণ তার মধ্যে নেই, তবু আজও সে অতীতের গর্ব্ব করে, আজও সেই পৈতে তুলে অভিশাপ দেয়। ব্রাহ্মণের সে ক্ষমা নেই, ত্যাগ নেই, আছে ভোগের স্পৃহা, এতটুকু নিয়ে মারামারি, এতটুকু নিয়ে কলহ। এমনভাবে সব হারিয়ে বর্ত্তমান থাকার চেয়ে ব্রাহ্মণ ধরণীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক না কেন চক্রবর্ত্তী মশাই? আজ সব হারিয়ে কেবল অতীতের গর্ব্ব জাগিয়ে রাখবার তার কি দরকার আছে?

জয়ন্তের চক্ষু দুইটী যেন জলিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিয়াছিল—

তাহার সেই উদ্ধত মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া যদুনাথ থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন—চোখের পলক তাহার পড়ে নাই।

জয়ন্ত বুঝিয়াছিল সে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, চকিতে সে নিজেকে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

যদুনাথ সচকিত হইয়া উঠিলেন, "বলিলেন—আজ চলি বাবাজি, এ সব কথা বরং অন্যদিন আলোচনা করা যাবে, আজ আমার কাজ আছে কি না—"

কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

জয়ন্ত অলস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল—

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণত্ব—সে যে কত বড় সাধনার বস্তু তাহা ইহারা কি করিয়া জানিবে? কেবলমাত্র কয়েকগাছা সূতা স্কন্ধে ধারণ করিয়া বেড়ানোই যদি ব্রাহ্মণের পরিচয় পত্র হয় তাহা হইলে তো ভাবনাই থাকিত না।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঊর্দ্ধপানে তাকাইল।

১৯

অমূল্য বারাণ্ডায় একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছিল।

কয়েকদিন সে এখানে ছিল না, কাল বৈকালে ফিরিয়াছে। কাল সে আসিবামাত্র যদুনাথ দেখা করিতে গিয়াছিলেন, অমূল্যের গম্ভীর অথচ বিমর্ষ মুখের পানে তাকাইয়া তিনি বেশী কথা বলিবার সাহস করেন নাই।

অমূল্য বালিগঞ্জের বাড়ীতে গিয়াছিল।

মিনার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল মুহূর্ত্তের জন্য। বাড়ীতে পৌঁছাইয়া ভবেশ চৌধুরীর সহিত দুই চারিটী কথা বলিবার পরই সে শুনিতে পাইল মিনা সেইদিনই বম্বে বেড়াইতে যাইতেছে।

ভবেশ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, "কেন যে সে যাচ্ছে—কোথায় থাকবে সে সম্বন্ধে কোন কথা আমায় সে বলেনি, আজই হঠাৎ সকালে আমায় জানিয়েছে সে মাসখানেকের মত চলে যাচ্ছে।"

বিবর্ণ মুখে অমূল্য বলিল, "আপনি অনুমতি দিলেন? ম্লান হাসিয়া

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, না দিয়েও জোট পায় নেই। চিরদিন যাকে নিজের মতে নির্ভর করে চলতে দিয়েছি, আজ তাকে পরের মতানু-বর্ত্তিনী করা বড় সহজ কথা নয় অমূল্য।"

এই মুহূর্ত্তটীতে বোধ হয় পরলোকবাসিনী স্ত্রীর কথা মনে হইয়াছিল, ভবেশ চৌধুরী দুই হাতের কনুই টেবলে রাখিয়া করতলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

নিজের স্নেহের দৈন্যতাও মনে জাগিয়াছিল, আজ যদি মিলার মা থাকিত, ঘরের প্রতি তাহার আকর্ষণ থাকিত, এমন করিয়া অতি সহজে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিত না, পিতার সান্নিধ্যে সে আসিয়াছে খুবই কম, পিতার সহিত তাহার দেখাশুনাও হয় কম, কাজেই পিতার প্রতি দায়ীত্বও তাহার কম। পিতা বরাবর নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন—সেই একনিষ্ঠ কর্ম্মের নিকটে স্নেহ স্থান পায় নাই, একথা বলা চলে না—তবে থাকিলেও মিলা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছে।

ঘরের প্রতি আকর্ষণ তাই তাহার নাই, কাহারও প্রতি কর্ত্তব্য আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। কেবল পড়াশুনা, কেবল খেলাধুলা, কেবল মিথ্যা কাজেই তাহার দিন গিয়াছে। কতদিন অন্তরঙ্গভাবে পিতাকে কাছে পাইতে সে উৎসুক হইয়াছে, কতদিন পিতার কাজ করিতে গিয়াছে, পিতা অত্যন্ত সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে আমল দেন নাই, নিজের কর্ম্মময় জগতের মধ্যে কন্যাকে টানেন নাই।

এমনই করিয়া মিলা রহিয়া গিয়াছে দূরে—কাজেই সে হইয়া উঠিয়াছে, অত্যন্ত খেয়ালী—অত্যন্ত জেদী। পিতা কোনদিন তাহার খেয়ালে বাধা দেন নাই, আজও বাধা দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

যে কর্ম্মকে একদিন জীবনের শ্রেষ্ঠরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আজ তাহাকেই মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে,—সম্পূর্ণ একঘেয়ে, সম্পূর্ণ নিরানন্দ জীবন—, আজ মনে হয় যদি তিনি মিলাকে কাছে পাইতেন—যদি তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নিজের ভার ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আর উপায় নাই, হাতের যে ঢিল ছোড়া হইয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মুখ তুলিলেন, অমূল্য তখনও অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল, ভবেশ চৌধুরী শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমি মিলাকে বাধা দেব না অমূল্য, তুমি বরং একবার তাকে বলে দেখ গিয়ে। শুনবে যে সে আশা নেই, তবু চেষ্টা করে একবার দেখ।—"

সামনের অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে, মাঝে কার্ত্তিক মাস।

কিছু না মানিলেও ভবেশ চৌধুরী ভাদ্র আশ্বিন ও কার্ত্তিকের মধ্যে বিবাহ দিবার মত দেন নাই। মনের অন্তঃস্থলে হয়তো কোথাও এতটুকু গলদ ছিল, বহিঃশিক্ষা তাঁহাকে একেবারে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত করিতে পারে নাই। বন্ধুরা হাসিয়াছিলেন,—কিন্তু ভবেশ চৌধুরী বলিয়াছিলেন—"মেয়ে তো আমার একা নয়; মেয়ের ভাগীদার আরও একজন ছিল যে; আজ সে জগতে বর্ত্তমান না থাকিলেও তার মতটা আমার মেনে নিয়ে চলতে হবে তো।"

ইহার উপর আর কথা চলে না।

অমূল্য ইহাতে খুসি হইতে পারে নাই।

যে মানুষ সম্পূর্ণ বৈদেশিকভাবে চলে সভ্যতার লীলানিকেতন ইউরোপে একবার নয়—পাঁচ সাতবার গিয়াছে,—সম্পূর্ণভাবে যাহাদের মতে সে চলে, তাহার মধ্যে এরূপ সংস্কার থাকার হেতু সে খুঁজিয়া পায়

না। এই মানুষটী কিছুই জানেন না, কেবল কন্যার বিবাহের সময়ই কেন যে এই মতটা অনায়াসে মানিয়া লইলেন তাহা সে ঠিক করিতে পারে না।

মিলা যাত্রার আয়োজন করিয়া লইয়াছিল—এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল অমূল্য—

প্রথম সাক্ষাতেই সে প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, "না এ হতেই পারে না মিল, কিছুতেই হতে পারে না।"

মিলা শান্তকণ্ঠে বলিল, "এ কথাটা এত চেঁচিয়ে না বলে আস্তে আস্তেও বলা চলে; এখনি চাকর বাকরগুলো ছুটে আসবে এখন, ভাববে—না জানি কি কাণ্ড ঘটেছে।"

অপ্রস্তুতভাবে অমূল্য একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—মিলা বলিল, "শান্তভাবে বলুন—কি বলতে চাচ্ছেন, কি হতে পারে না, কেন হতে পারে না, এবার সে কথাগুলো একটু নরম সুরে বলে যান।"

অমূল্য বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি একমাসের জন্য বম্বে চলে যাচ্ছো।"

মিলা বলিল, "হ্যাঁ, যাচ্ছি, এখনই রওনা হব বলে আমি প্রস্তুত হয়েছি।"

অমূল্য বলিল, "মিঃ চৌধুরীর অনুমতি না নিয়ে এরকম ভাবে চলে যাওয়ার মানে?"

মিলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "অনুমতি নিয়েছি কি না সে জবাবদীহি আপনার কাছে আমি করব না মিঃ মিত্র, সে জবাব চাইবার অধিকারও আপনার এখনো হয়নি—হবে কি না তারও ঠিক নেই, অনর্থক—"

সে চুপ করিয়া গেল—

ব্যগ্র হইয়া অমূল্য বলিল, "হবে কি না তার মানে? আমি তোমার কথা বুঝতে পারলুম না মিল,—"

অমূল্য তাহার পানে তাকাইল।

মিলা একটু হাসিল, "আপনি ভারী বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ মিত্র। আমি আপনাকে এই কথাটী মাত্র জানাচ্ছি—আপনি জানেন বাবা আমার কোন কাজে কোনদিন বাধা দেন নি, আজও তিনি বাধা দেন নি, যত টাকা দেওয়ার কথা বলেছি তিনি তা দিতে রাজি হয়েছেন। আপনি যান, বাবার কাছে আপনার যা কাজ আছে করুন গিয়ে, আমায় এখনি যেতে হবে।"

অমূল্য বলিল, "দুমাস পরে যাকে আমার সহধর্ম্মিনীরূপে পাব, তাকে আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আজ নেই মিল?"

মিলা ততক্ষণে কলিং বেল বাজাইয়া চাকরকে ডাকিল, সে আসিতে তাহাকে আদেশ দিল, "মোটর তৈরী করতে বল, ট্রেণের সময় হয়েছে।"

তাহার পর অমূল্যের দিকে ফিরিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আগে বিয়ে হোক, সহধর্ম্মিনীরূপে আমাকে পান, তারপর ওসব কথা হবে।"

অমূল্য রাগে ফুলিতেছিল, তবু একটি কথা সে বলিতে পারিল না।

উঠিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া দেয়ালে বিলম্বিত একখানি ফটো তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অমূল্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের মন্দিরে প্রতিমার সামনে আরতি প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া এ কে?

দীর্ঘ ঋজু আকৃতি, প্রদীপ্ত মুখ চোখ, অনাবৃত সুপুষ্ট বিশাল বক্ষ— এ কে?

অমূল্যের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল, সে আবার দেখিল, বারবার দেখিল "জয়ন্ত—?"

মিলা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল—"হ্যাঁ মন্দিরের পূজারী।"

অমূল্যের ভিতরে এখন আগুন জ্বলিতেছে, জিজ্ঞাসা করিল "এ ফটো কোথায় পেলে মিলা?"

মিলা উত্তর দিল, "আমি তুলেছি—"

অমূল্য কেবল মাত্র বলিল—"হুঁ—"

সে বাহির হইয়া গেল।

বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বলে, অমূল্য এ জ্বালা সহ্য করিতে পারে না।

বাহিরে ভবেশ চৌধুরী তখন জুটমিল সংক্রান্ত একটা সমস্যা সম্বন্ধে অন্য ডিরেক্টারদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন, অমূল্য বিমর্ষ মুখে একটু দূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ভবেশ চৌধুরী পলকের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর বুলাইয়া লইলেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব তাঁহার মুখে ফুটিতে দেখা গেল না।

বাহির হইতে মিলা ডাকিল, "বাবা—"

ভবেশ চৌধুরী কথা কহিতে কহিতেই উত্তর দিলেন, "এসো—"

মিলা দরজার পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল, কোন ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি বাবা, ট্রেণের সময় হয়েছে—"

মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় বিস্মৃতি জাগিয়াছিল, চকিতে ভবেশ চৌধুরী নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, স্থির কণ্ঠেই বলিলেন, "বেশ, একটু তাড়াতাড়ি ফিরবার চেষ্টা করো।"

গম্ভীরভাবে তিনি আবার আলোচনায় রত হইলেন, মিলা যে কখন চলিয়া গেল, তাহা তিনি জানিলেন না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল, এখনি অফিসে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভবেশ চৌধুরী উঠিলেন।

বাহিরের বারাণ্ডায় অযথাই তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, রেলিংয়ে ভর দিয়া নিতান্ত অনর্থক সামনে যে দীর্ঘ পথটা পড়িয়া আছে তাহার পানে শ্রান্ত চোখে চাহিলেন, মুখ হইতে ক্লান্তিসূচক একটী মাত্র শব্দ বাহির হইল—আঃ—

এ বোঝা নামাইতে পারিলে তিনি যেন বাঁচেন,—এখন তিনি মুক্তি চান,—

মুক্তি,—

কথাটা মনে করিতেও হাসি পায়।

মুক্তি তাঁহার জীবনে নাই, তাঁহার মাথার বিরাট বোঝা তিনি নামাইবেন কোথায়? আজ বড় ক্লান্ত হইলেও কাহারও উপর ভর দিবার উপায় নাই, পীড়িত হইলে মাথার কাছে বসিতে কেহ নাই।

যে যেটুকু করিবে সেটুকে করিবে কেবল অর্থের বিনিময়ে, প্রকৃত ব্যথার ব্যথী তাঁহার নাই। কেহ নাই।

আস্তে আস্তে তাঁহার চোখ দুটির সামনে সব ঝাপসা হইয়া আসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেই দেখিতে পাইলেন—পিছনে অমূল্য দাঁড়াইয়া আছে।

শুষ্ক হাসিয়া ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "মিল চলে গেছে। যাক, দুদিন বেড়িয়ে আসুক, তাতে ওর মনটা ভালো হবে। দেশে প্রথমে কিছুতেই যেতে চায় নি, তারপরে কি মন করে যেতে রাজী হল,—হঠাৎ দেশকে ওর কি ভালো লেগে গেল জানিনে। আসার দিন ষ্টেশনে দেখলুম—মিলের চোখে জল,—সদাহাস্যময়ী আমার মিল—"

ভবেশ চৌধুরী থামিয়া গেলেন, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেশ থেকে এসে মিল যেন সর্ব্বদা কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে আছে। খেলতে বেড়াতে এত ভালোবাসত, আমি আমার হাজার কাজের ফাঁকে হাজার বার চেয়ে দেখি, সে আর খেলতে বেড়াতে চায় না; আমার বয়ের কাছে শুনি—সে দিনরাত বই নিয়ে পড়ছে, সে বইও ইংরাজি নয়, এমন কি বাংলাও নয়, শুনে আশ্চর্য্য হবে অমূল্য—সে সব সংস্কৃত বই।"

অমূল্য শুষ্ককণ্ঠে কেবলমাত্র বলিল, "হুঁ—"

উৎস যে কোথায় তাহা সে জানে—তবু এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না।

কাজের জন্য তাহাকে কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিতে হইল, এ কয়েকদিনের মধ্যে ভবেশ চৌধুরীর মুখে মিলার সম্বন্ধে কোন কথাই আর সে শুনিতে পাইল না। আশ্চর্য্য হইয়া সে দেখিল ভবেশ চৌধুরী নিয়মিত ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত নিজের কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই,—কাজে এতটুকু আলস্য নাই।

কয়েকদিন থাকিয়া অমূল্য আবার গ্রামে ফিরিল।

অমূল্য কাগজপত্র উল্টাইতেছিল,—

দ্বারোয়ান আসিয়া খবর দিল—ঠাকুর মশাই আসিয়াছেন—

"ঠাকুর মশাই—"

অমূল্যের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল, অকস্মাৎ দৃপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "হাঁকিয়ে দাও, বল দেখা হবে না।"

দ্বারোয়ান সেলাম দিয়া চলিয়া গেল।

নিষ্ফল আক্রোশে অমূল্য গর্জ্জিতে লাগিল।

জয়ন্ত আসিয়াছে। কোথা হইতে এ লোকটা ধূমকেতুর মত তাহার ভাগ্যাকাশে উদয় হইল, তাহার বর্ত্তমান অন্ধকার করিয়া দিল, ভবিষ্যৎকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিল।

অমূল্য কতখানি আশা করিয়াছিল। আজ যে জমিদারীতে সে বেতনভোগী ম্যানেজার হইয়া আছে, অদূর ভবিষ্যতে সেই হইবে সেখানকার প্রভু—জমিদার। জুটমিলের প্রধান অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে সেই লাভ করিবে, সুন্দরী মিলা ও ভবেশ চৌধুরীর সঞ্চিত বহুল অর্থ বাড়ী সবই তাহার হইবে।

অমূল্য তাসের ঘর গড়িয়াছিল, কল্পনায় শূন্যে দুর্গ তৈয়ারী করিয়া সে অনেক কিছুই কল্পনা করিয়াছিল, একটী ফুৎকারে তাহার সে তাসের প্রাসাদ খসিয়া পড়িল।

এ সব কাহার জন্য?

আগে একটু সন্দেহ করিলেও সে সন্দেহ এমন দৃঢ় হয় নাই,—মিলার

ঘরে জয়ন্তের ফটো দেখিয়া এক নিমেষে তাহার সকল আশা ভরসা দূর হইয়া গেছে, সে তাহার কল্পনার স্বর্গ হইতে ধপাস করিয়া ধরণীর ধূলার মধ্যে পড়িয়া গেছে।

অমূল্য দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া গর্জিতে লাগিল—দেখা যাক, সে ঠিক ব্যবস্থা করিতে পারে কি না। উপযুক্ত প্রতিশোধ সে লইবে, সহজে অমূল্য মিত্র ছাড়িবে না।

হঠাৎ মুখ তুলিতেই সে দেখিতে পাইল—জয়ন্ত কখন আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে অমূল্য বলিল, "আমি বারণ করেছি তবু আমার হুকুম না শুনেই—"

বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "হ্যাঁ আপনার হুকুম না শুনেই আমি এসেছি। অন্য সময় হলে আমি ফিরে চলে যেতুম, কিন্তু এ সময় আমায় আপনার অপমান সয়েও আসতে হয়েছে।"

—অমূল্য তীব্রনেত্রে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার দেখিয়া লইল।

বলিল, "এখন আমি ভারি ক্লান্ত, অন্য সময় আসবেন, আপনার কথা শোনা যাবে—"

সে আবার খাতাপত্র দেখিতে লাগিল।

জয়ন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনার খাতাপত্র বরং পরে দেখা চলবে, আমার কথাটা আগে আপনি শুনে নিন,—বিচার করুন, আমি চলে যাই। ওদিকে আমারও ঢের কাজ আছে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় আমার নেই।"

ক্রোধে অমূল্যের মুখ লাল হইয়া উঠিল, হাতের পেন্সিলটা সজোরে

টেবলের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এ আপনার খুব অন্যায়; আমার সময় নেই দেখছেন—আমার কাজের সময় এরকম ভাবে বিরক্ত করতে আমাকে আমি কোন মতে সইতে রাজি নই।"

জয়ন্ত বলিল, "আমার মনে হয় আপনাকে সকল সময় প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য এ সব অভিযোগ শুনবার জন্যে। আপনি না শুনতে চাইলেও আমায় জোর করে আপনাকে শুনবার জন্যে বাধ্য করতেই হবে নচেৎ—"

"জোর করে—"

বেচারা অমূল্য—

জয়ন্তের দীর্ঘ শক্তিশালী দেহের পানে তাকাইয়া সত্যই সে থতমত খাইয়া গেল।

হ্যাঁ, জোর সে করিতে পারে কারণ সে শক্তিশালী। যাহার শক্তি আছে সে তাহার সেই শক্তির ব্যবহার করিতে অধিকারী। বেচারা দুর্ব্বল অমূল্য—

সে ঘামিয়া উঠিল, কারণ জয়ন্তের শক্তির পরিচয় সে জানে।

শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "বলুন কি বলতে চান?"

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার সামনে টেবিলের অপর পার্শ্বে বসিল; বলিল, "অনেক পথ হেঁটেছি, ভারি ক্লান্ত বলেই বিনা অভ্যর্থনাতেও চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে হল, এ অভদ্রতার জন্যে মনে কিছু করবেন না ম্যানেজার বাবু। আমার এটা সম্পূর্ণ অভদ্রতা বটে, কিন্তু আপনার পক্ষেও এটা নিতান্ত ভদ্রতা নয়—বিশেষ আপনি যখন পাশ্চাত্যে গিয়া সভ্যতা শিক্ষা ইত্যাদি কথা ও নীতিগুলি নিক্তি ধরে ওজন করে বুঝে নেন।"

অমূল্য রাগিলেও প্রকাশ করিতে পারিল না। নিজের সীমানার

মধ্যে নিজের বাড়ীতেও সে এই মুহূর্তে নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় বলিয়া মনে করিল।

জয়ন্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের পানে তাকাইয়াছিল, দেখিল সে একটীও কথা বলিল না। জয়ন্ত বলিল,—"আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই—রামলোচন দাস একমণ চাল নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে মারধর করে আপনার লোকেরা চাল কেড়ে নিয়েছে,—কেন এরকম করলে আমি তাই জানতে চাচ্ছি।"

ক্রোধ আর চাপা থাকে না, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া অমূল্য বলিল, "হ্যাঁ, তারা আমার হুকুমে চাল কেড়ে নিয়েছে, তাকে মেরেছে—"

জয়ন্ত বলিল, "এবং তাকে কাছারী বাড়ীতে বন্ধ করে রেখেছে—"

অমূল্য বলিল, "রেখেছে—তাতে কি?"

জয়ন্ত বলিল, "আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"নিয়ে যেতে এসেছেন,—"অমূল্যের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

শক্তভাবে জয়ন্ত বলিল, "হ্যাঁ, তাকে নিয়ে যেতে এসেছি। নিরপরাধী সে, আমার হুকুম তামিল করছিল মাত্র, এরজন্যে সে শাস্তি পেতে পারে না।"

অমূল্য তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার পানে তাকাইল, বলিল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভশ্চায, বাজারে চালের মণ কত করে বলুন তো?"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "ক্ষমা করবেন, চাল কিনে আমি কোনদিন খাইনি কাজেই ওর দর আমার জানা নেই। আমার মনে হয়—আমার চেয়ে এ কথাটা আপনারই ভালো করে জেনে রেখে দেওয়া দরকার ছিল, তা হলে আর আমার কাছে জিজ্ঞেস করে ঠকতে হতো না।"

অমূল্য মাথা দুলাইল—"কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ভশ্চায, আপনি যে চাল বিক্রি করে যাচ্ছেন, সে খবর আমি পেয়েছি।"

জয়ন্ত হাসিল, চাপা হাসি নয়—হো হো করিয়া প্রাণ খোলা হাসি; খানিকক্ষণ হাসিয়া হাসি থামাইয়া সে বলিল, "ঠিক ধরেছেন যা হোক। এ খবর আপনাকে কে দিলে বলুন দেখি ম্যানেজার বাবু? তাই বুঝি বেচারা রামলোচনের কাছ হতে চাল কেড়ে নিয়েছেন, উত্তম মধ্যম মার দিয়েছেন, শেষকালে তাকে আটক পর্য্যন্ত করে..."

অমূল্য রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া বলিল, "নিশ্চয়—তাই-"

জয়ন্ত বলিল, "আপনি যারই কাছ হতে শুনুন—একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখলেন না কেন? আমি মন্দিরের পূজোর জন্যে যে টাকা পাই তাতে পুজো আর আমার খরচ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বাড়ীতে যে সব চাল থাকে—আমি দরিদ্রদের দান করি—এ কথা আপনার বিশ্বাস হয়—?"

অমূল্য মাথা নাড়িল—"না—"

জয়ন্ত বলিল, "আমি তা জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না। তবু আমি বলছি—শুনুন। রামলোচন ওই একমণ চাল নিয়ে যাচ্ছিল, তার বাড়ী হতে কত লোক ওই চাল নিয়ে যায়, আপনার সংবাদদাতা সে খবরটা আপনাকে জানাতে ভুলে গেছে বোধ হয়, অথবা ইচ্ছে করেই জানায়নি, বরং বিকৃত করে জানিয়েছে। ম্যানেজার বাবু, এ কথাটা জানবেন—জয়ন্ত ভশ্চায গরীব হলেও তার মধ্যে প্রাণ আছে, সে কিছু নিয়ে আত্মসাৎ করতে চায় না, বরং সকলকে বাঁচাতে চায়।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—

অমূল্য বলিল—"বসুন উঠলেন কেন?"

অমূল্য উত্তর দিল, "না এরপর আপনার সামনে ধৈর্য্য রাখা ভারি

মুস্কিল হবে, তার চেয়ে সরে যাওয়া ভালো। আপনি আমার কথার সত্যাসত্যতা জানিতে নিজে ও এ গ্রামে, এর আশপাশ গ্রামে খোঁজ করবেন; আমার মনে হয় যারা সত্যি উপকৃত হয়—খেয়ে বাঁচে, তারা সত্যি কথাই বলবে।"

দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল, সোজা অমূল্যের সামনে দাঁড়াইল,—দুইটী হাত একবার সে সামনে প্রসারিত করিল, একবার সোজা মাথার উপর তুলিল, গভীর কণ্ঠে বলিল,—"বড় হওয়ার প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগায় অর্থলিপ্সা,—মানুষকে করে তোলে বিবেকশূন্য পশু—তাতো বিশ্বাস করেন ম্যানেজার বাবু। তাই দরিদ্রের মধ্যে যে ধর্ম্মবুদ্ধি, যে বিবেক, যে কর্ত্তব্য জ্ঞান জেগে থাকতে দেখা যায়, ধনীর মধ্যে তা দেখা যায় না। আপনি ম্যানেজার বাবু,—ম্যানেজার না হয়ে যদি গরীব অমূল্য মিত্র হয়েই থাকতে পারতেন, আপনার মনুষ্যত্ব শুকিয়ে যেতো না, অনেকে তাতে বাঁচতো। পাশ্চাত্যে শিক্ষালাভ করেছেন—এ হয়েছে আপনার অহঙ্কার, এই আপনার উন্নতি, কিন্তু কি শিখেছেন আপনি, আজ আমি আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করি? শিখেছেন আত্মম্ভরীতা, শিখেছেন কেউ স্বেচ্ছায় না দিলেও জোর করে সম্মান আদায় করতে, আর তারই জন্যে গরীব দুর্ব্বলের 'পরে চালিয়ে যান অবাধ নির্যাতন—অবাধ অত্যাচার, কিন্তু আর নয়—ওরা জেগেছে, এবার আপনাকেই পিষে মারবার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে, একদিন আসছে যেদিন আপনার মত লোকদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে হবে—আপনাদের এতটুকু চিহ্ন মাত্র থাকবে না।"

ক্ষণভরে সে অমূল্যের বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইল, অমূল্য কাঁপিতেছে তাহা দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল।

হাত দুখানা শ্লথভাবে ঝুলাইয়া জয়ন্ত বলিল, "ভয় নেই; আমি ব্রাহ্মণ,—অনেক সাধনার ফলে যেটুকু আমি পেয়েছি তা আমি নষ্ট করব না। আপনার বা আর কারও অনিষ্ট আমি করব না এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার বাবা ইচ্ছা করলে একদিন জমিদার ভবেশ চৌধুরীকে গলা টিপে আছাড় দিয়ে মারতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি, তাঁর ঔদার্য্য, মহান্ সহিষ্ণুতা তাঁকে রক্ষা করেছিল সে মহাপাতক হতে। আজ চুরির অপবাদ শুনেও আমি যেমন সহ্য করে গেলুম, তিনিও সেদিন এমনইভাবে সহ্য করেছিলেন। মনে রাখবেন—আমি অন্তঃসারশূন্য পৈতের গোছা মিছে বয়ে বেড়াইনে, ওর মর্য্যাদা আজও রক্ষা করে চলতে প্রাণপণ চেষ্টা করি। সকলকে এক চোখে দেখে যাচাই করতে যাবেন না—বিপদ ঘটবে।"

শান্তভাবে সে বাহির হইয়া গেল।

অমূল্যেরও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল—

সাংঘাতিক লোক এবং এ লোক যে সহজেই খুন করিয়া ফেলিতে পারে এ কথা অমূল্য জানে। নিজের হাতে সে কিছু না করুক, এই সব বর্ব্বর অশিক্ষিত প্রজাগুলাকেও তো ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারে এবং সে বিদ্রোহের ফল যে অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অমূল্য জানে।

দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অমূল্য ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া এই লোকটাকে জব্দ করা যায়, জেলে দেওয়া যায়।

২১

কয়েক মাসের টাকা হইতে জয়ন্ত পঁয়ত্রিশ টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছিল।

এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে টাকাগুলির জন্ত তাহার শান্তি ছিল না। কোনক্রমে টাকা কয়টী পাঠাইতে পারিলে সে তাহার বইগুলা ফেরত পায়; তাহার স্বর্গতঃ জননীর আত্মাও শান্তিলাভ করিতে পারেন।

টাকা কয়টী সেদিন সে যে গ্রাম্য-পোষ্ট অফিসে গিয়া উর্ম্মির নামে মনিঅর্ডার করিয়া দিয়া আসিল, সে কথা সেই মুহূর্ত্তে অমূল্যের কাণে গিয়া পৌঁছাইতে দেরী হইল না।

জয়ন্ত কুপনে নিজের ঠিকানা দিয়া জানাইল—এই টাকা পাইবা মাত্র উর্ম্মি যেন তাহার বইগুলা তাহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়, একটুও দেরী না করে। সে বইগুলি না পাইলে তাহার কোন কাজ হইতেছে না, সেজন্য সে তাড়াতাড়ি বইগুলা ফিরাইয়া পাইতে চায়।

ইহারই কয়েকদিন পরে উর্ম্মির একখানা পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে সে জানাইয়াছে—পোষ্টে এতগুলা বই পাঠাইবার দারুণ অসুবিধা থাকায় সে পাঠাইতে পারিল না,—জয়ন্ত যদি একদিন সময় করিয়া আসে, সে তাহার হাতে বই দিয়া দিবে। উর্ম্মির পত্র পাইয়া জয়ন্তের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, সে তখনি একখানা পত্র বেশ কড়াভাবে লিখিয়া দিল। সেই পত্রে জানাইল, উর্ম্মির স্পর্দ্ধা অসহ্য—সে জয়ন্তকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চায়। উর্ম্মির জানিয়া রাখা উচিত, সাধারণে তাহাদের ষ্টেজে বা ফিলমে দেখিয়া হাততালি দিতে পারে, বাহবা দিতে পারে, তাই বলিয়া তাহাদের সংস্রবে আসিতে চায়

না। তাহারা যে কোন স্তরের মেয়ে তাহা বুঝিয়া জয়ন্তকে ঐ ক
লেখা উচিত ছিল।

এ পত্র ঊর্ম্মি যখন পড়িল তখন নিস্তব্ধ হইয়া রহিল,—

জয়ন্ত তাহাকে ঘৃণা করে তাহা সে জানে। প্রথম দিন সে যখন জয়ন্তের ঘরের দিকে গিয়াছিল তখন তাহার মুখে যে ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে চিত্র আজও ঊর্ম্মির মন হইতে মিলায় নাই।

ঘৃণ্য অভিনেত্রী জীবন—

ঊর্ম্মির কান্না পায়, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

তাহারই সঙ্গে মনে পড়ে বস্তী-বাসিনী সেই বউটীর কথা। ঊর্ম্মি কুড়িটা টাকা তাহাকে দিতে গিয়াছিল মেয়েটী তাহা স্পর্শও করে নাই, পিছাইয়া গিয়া হাতযোড় করিয়া বলিয়াছিল, "আমায় মাপ করুন, ও টাকা দিয়ে আমি আমার স্বামীর চিকিৎসা করতে পারব না। কত সতী সাধ্বীর চোখের জল মাখানো ও টাকা, কত লোকের সর্ব্বনাশের ফল ও টাকা,—ও নিলে আমার মঙ্গল হবে না।"

ঊর্ম্মি বজ্রাহতের মত তাহার পানে তাকাইয়া ছিল, তাহাকে আর একটী অনুরোধ করার ক্ষমতা তাহার হয় নাই।

সেই অবহেলা তাহার বুকে আগুণ জ্বালাইয়া দেয়।

কিন্তু সে তো সত্য কথাই বলিয়াছিল—সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা সত্য বই কি? ঘৃণিতা নারীর গর্ভজাতা, নিজে সে সচ্চরিত্রা থাকিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিবে কে?

অনাদি মিত্র আসিয়াছেন।

ঊর্ম্মি তাহার সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে কোন কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করে না, নীরবে তাহার কাজ করিয়া যায়।

অনাদি মিত্র কোনদিন তাহার নিকট জানিতে চাহেন নাই—কেন সে ফিলমে গেল, আবার হঠাৎ ছাড়িয়াই বা দিল কেন? তাহার নিকট কিছু না শুনিলেও মোক্ষদা তাঁহাকে জানাইয়াছিল—ফিলমে নামিয়া সেখানকার ম্যানেজারের অশিষ্ট আচরণের জন্যই সে চলিয়া আসিয়াছে। ম্যানেজার তাহাকে আরও পাঁচজন মেয়ের মতই ভাবিয়াছিলেন, সে যে সত্যই সৎ কেবল খেয়ালের বসে ফিলমে যোগ দিয়াছিল তাহা, তিনি জানিতেন না।

অনাদি মিত্র চুপ করিয়া মোক্ষদার কথা শুনিলেন—মোক্ষদা উৎসাহ-ভরে শুনাইয়া দিল—সত্যই এমন, ভালো মেয়ে খুবই কম দেখা যায়। সে মিশিয়াছে সকলের সঙ্গে, কিন্তু পাঁকাল মাছের মত কেমন করিয়া সে হাত ফস্কাইয়া খসিয়া পড়ে কেহ তাহার নাগাল পায় না।

উর্ম্মি এ সব কথা কিছুই জানিতে পারিল না—।

একবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আবার চলে যাবেন সেখানে—যেখানে কাজ করেন?"

অনাদি মিত্র, উত্তর দিলেন, "না আর যাব না।"

বাড়ী হইতে তিনি খুব কমই বাহির হন, বেশীরভাগ বই লইয়া নিজের ঘরে সময় কাটাইয়া দেন,—ছাদের উপর ভ্রমণ করেন। উর্ম্মি লক্ষ্য করিল—তিনি রাত্রি ছাড়া বাহির হন না, দিনে তাঁহাকে মোটেই বাহির হইতে দেখা যায় না।

উর্ম্মি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবে—

এই সেই ধনপতি গাঙ্গুলী, কুড়ি বৎসর আগেকার আকৃতির সঙ্গে হয়তো আজ তাহার মিল হইবে না, আজ তাঁহাকে দেখিয়া সেদিনকার অন্তরঙ্গ বন্ধুও চিনিতে পারিবে না, তবু তিনি এত সশঙ্ক।

সেদিন নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই উর্ম্মি তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, অনাদি মিত্র তখন ছাদে গিয়াছিলেন, তাঁহার বিছানার উপর ছড়ানো পড়িয়াছিল কতকগুলা কাগজ পত্র।

কয়েকখানা ফটো ইতস্ততঃ ছড়ানো পড়িয়াছিল, কৌতূহলাক্রান্ত উর্ম্মি ফটোগুলো দেখিতে লাগিল। একখানি ফটোতে একটী সুন্দরী মেয়ে বসিয়া আছে, তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া একটী যুবক। ইহার মুখখানা দেখিয়া পরিচিত মনে হয়—

ঠিক, এ মুখ উর্ম্মির পরিচিত—এ ফটো অনাদি মিত্রের যৌবনকালের।

এই সম্ভব তাঁহার স্ত্রী—উর্ম্মির মা।

উর্ম্মি ফটোখানা উপুড় করিয়া রাখিল— ।

আর একখানি ফটোতে শিকারীবেশে সজ্জিত অনাদি মিত্র ও আর একটী যুবক। এ লোকটীকেও পরিচিত মনে হয়, কোথায় দেখিয়াছে উর্ম্মি তাহা মনে করিতে লাগিল।

পিছনে পদশব্দ শুনিয়া উর্ম্মি মুখ ফিরাইল—অনাদি মিত্র ঘরে প্রবেশ করিতে উর্ম্মিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন "অন্যায়—ভারি অন্যায়।"

উর্ম্মি প্রথমটা থতমত খাইয়াছিল, এখন ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমার মনে হয়—অন্যায় আমি কিছু করিনি,—ছেলে মেয়ের উচিত তাদের বাপমায়ের সম্বন্ধে সব কিছু জানা, অবশ্য আমি যে চুরি করে এ সব জানব বলে এসেছি তা নয়, আপনিই এ সব ব্যাপার আমার চোখে পড়ে গেছে।"

"বাপমায়ের সম্বন্ধে জানা—"

অনাদি মিত্র একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

ঊর্ম্মি শান্তভাবে বলিল, "হ্যাঁ, বাপমায়ের সম্বন্ধে সব কিছু জানা। অন্ধভাবে আমি ভক্তি করতে পারব না, আমি তাই চাই সব কিছু জানতে। আমায় দয়া করে সব বলুন বাবা, আমায় এমনভাবে অন্ধকারে ফেলে রাখবেন না অনুনয় করছি।"

বাবা—একি সম্বোধন। কই, এতকালের পরিচয়ে সে তো কোনদিন পিতৃ সম্বোধন করে নাই।

অনাদি মিত্র মুহূর্ত্তকাল পলকহীন নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ঊর্ম্মি কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, "আপনার পিছনে কত বড় একটা ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, আপনার সন্তানকে আপনি তা কোনদিন জানতে দেন নি—কোনদিন হয়তো স্বেচ্ছায় জানতেও দেবেন না। এর চেয়েও বড় দুর্ভাগ্যের কথা আমার, আপনার মেয়ে হয়ে আমি জানতে পারিনি—আপনি আমার কে—আপনি আমার কতখানি আপনার। চিরদিন পরের চেয়েও বেশী দূরে রেখে এসেছেন, আজও আমায় তেমনি দূরে রেখে চলেছেন, আপনার নাম করে প্রকৃত গৌরব নিয়ে দাঁড়ানোর মুখ আমার নেই,—ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে—আমার বাপ বর্ত্তমান থাকতেও আমি—"

"ব্রাহ্মণের মেয়ে—ব্রাহ্মণ—"

কাঁপিতে কাঁপিতে অনাদি মিত্র একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ঊর্ম্মি দৃঢ়ভাবে বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি বিখ্যাত বদান্য জমিদার ধনপতি গাঙ্গুলী—আজও তো আপনার নাম মুছে যায় নি বাবা—"

হতভাগ্য পিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন, আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"সে কোন অতীতের কথা—বদান্য জমিদার এ সব নাম ধরণীর গা হতে মুছে গেছে উর্ম্মি, তবে খ্যাত আজও হয়ে আছি আর সেই বিখ্যাতি থাকার জন্যে আমায় আজও আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে।"

অনেকক্ষণ পিতা পুত্রী উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন—অনেকক্ষণ পরে ধনপতি মুখ হইতে হাত নামাইলেন—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হঁ্যা, আমারই নাম ধনপতি গাঙ্গুলী, আমি দেশের বড় জমিদার —আমার বার্ষিক আয় বড় কম ছিল না;—আজ আমার কিছু নেই, আমি অতি দরিদ্র, আমায় পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছে, নাম পর্য্যন্ত বদলাতে হয়েছে, এ সব সত্য—সব সত্য উর্ম্মি। তোমাকে আমি রেখেছিলুম অনাথ আশ্রমে, তারপরে আবার এনে দেই স্কুলে, বোর্ডিংয়ে রাখি, সব সত্য কথা। যে আমি কত লোককে মাসিক বেতন দিয়ে কাজে রেখেছি,—আমার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল জুট মিলে শত শত লোক কাজ পেয়ে অন্ন সংস্থান করেছে—সেই আমি সামান্য বেতনে পরের দেশে ভিন্ন নামে কাজ করে জীবিকানির্ব্বাহ করেছি—আমার মেয়ের খরচ চালিয়েছি।"

তিনি আবার চুপ করিলেন।

উর্ম্মি ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমায় তো কোনদিন একটা কথা বলেন নি বাবা—"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ধনপতি বলিলেন, "তোমায় বলব—কেন বলব? যে আমার সমস্ত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, সে তোমারই মা ছিল না, তোমারই জাত ছিল না?"

উর্ম্মি তাঁহার হাঁটুর উপর একখানা হাত রাখিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে নারীর পরিচয় আমার কাছে যেমন অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তেমনি

অজ্ঞাতেই থাক বাবা আমি আমার জীবনে তার ছায়া পর্য্যন্ত পাইনি, যাঁকে পেয়েছি তাঁকে যেন সুখী করতে পারি, এই আশীর্ব্বাদই আজ প্রথম মুখ ফুটে আমায় করুন বাবা।"

সে নত হইয়া পড়িল, তাহার মাথা ধনপতির পায়ের উপর নামিয়া পড়িল।

কঠিন চিত্ত ধনপতি দৃপ্তনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, কখন নিজের অজ্ঞাতেই তাঁহার দুটি চোখের দৃষ্টি অতি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বলিলেন, "ওঠো উর্ম্মি, আমি তোমাকেও একদিন যে সাধারণ সকল মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলে ঘৃণা করেছিলুম তারজন্যে আমি অনুতপ্ত, নিজের ভুল আমি বুঝেছি বলেই ঘরে বাস করব বলে এসেছি। চোরের মত লুকিয়ে বেড়াতে আর ইচ্ছা নেই,—হয়তো আমি ধরা পড়বো—কুড়ি বাইশ বছরের আগেকার অপরাধের বিচার আমার এখন হবে। কিন্তু তার আগে আমি প্রতিশোধ নেব—জ্বলন্ত প্রতিশোধ, তারপরে আমার ছুটি।"

উদ্বেগাকুল কণ্ঠে উর্ম্মি বলিল, "কিসের প্রতিশোধ বাবা—?"

ধনপতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "আমার বন্ধুত্বের—। একদিনকার কথা আমি ভুলিনি উর্ম্মি—দুশ্চরিত্রা নারীকে হত্যা করতে পেরেছিলুম, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু সেই শুভ অবসরে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইনি, কিন্তু পায়ের কাছে একটী এক বছরের শিশু আমার কাপড় চেপে ধরে আমায় সেদিন আর একটা হত্যা হতে রক্ষা করেছিল—সে শিশু তুমি। আমি তোমায় নিয়ে সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী ত্যাগ করি, তোমায় সেই রাত্রে অনাথ আশ্রমে দিয়ে তাদের কিছু টাকা একেবারে দিয়ে আমি পালালুম সুদূর আফগানিস্থানে। আমার দিন চললো প্রচ্ছন্নতার মধ্যে—ভিখারীর মত, আর আমার সেই বন্ধু, যে

আমার সর্ব্বনাশ করলে—সে একে একে আমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছে, আমার জুটমিলে সে হয়েছে আজ ম্যানেজিং ডাইরেকটার, সিনিয়ার পার্টনার, আজ সে লাখ লাখ টাকার মালিক,—সে, গৌরবে সকলের মাঝে বিচরণ করছে, আর আমি ?—খুনি—দরিদ্র, কারও কাছে পরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা নেই—আমি—"

বলিতে বলিতে তিনি অত্যধিক ক্রোধে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, আর একটী কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

২২

এক মাসের আগেই মিলা ফিরিল,—ভবেশ চৌধুরী যেমন শান্তভাবে তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, তেমনই শান্তভাবে গ্রহণ করিলেন। একটী বার জিজ্ঞাসাও করিলেন না—কেন যে গিয়াছিল—কোথায় গিয়াছিল, আবার মাত্র কুড়িদিনের মধ্যে সে ফিরিয়া আসিল কেন ?

সারাদিন মিলার ঘরের দেয়ালের দিকে চোখ পড়ে নাই, সন্ধ্যাবেলা কি মনে করিয়া দেয়ালের দিকে তাকাইতেই তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—জয়ন্তের সে ফটোখানা নাই। সন্দেহাকুল নেত্রে সে চারিদিকে তাকাইল,—না, যেখানকার যে জিনিষ সেখানেই তাহা রহিয়াছে, ফটোখানা এখান হইতে সরিয়া গেল কোথায় ?

মিলার মুখখানা প্রবল রোষে লাল হইয়া উঠিল, তাহার মন বুঝিতেছিল এ কাজ কাহার, তবুও সে স্পষ্ট প্রমাণ লইবার জন্য নিজের আর্দ্দালীকে ডাকিল।—

সে আসিয়া দাঁড়াইল, মিলা ভূমিকা না করিয়া আগেই জিজ্ঞাসা করিল, "আমি চলে যাওয়ার পর এ ঘরে কেউ এসেছিল ?"

আর্দ্দালী মাথা চুলকাইয়া উত্তর দিল, "এসেছিলেন—মিসি বাবা আপনাদের দেশের ম্যানেজার সাহেব এসেছিলেন।"

মিলা মুহূর্ত্তমাত্র নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "অথচ আমি তোমায় বার-বার বারণ করে দিয়েছিলুম আমি কোথাও গেলে কেউ যেন আমার ঘরে প্রবেশ না করে, তুমি আমার হুকুম শোননি। আচ্ছা, এর বিচার পরে হবে,—এখন আর যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক উত্তর দাও। ম্যানেজার সাহেব এ ঘরে এসে কি নিয়ে গেছেন?"

আর্দ্দালী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "একখানা ছবি নিয়ে গেছেন, বললেন তিনিই এখানা এনেছেন—আপনাকে দেখতে দিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি আপনি চলে যাওয়ায় ফিরে নেওয়া হয় নি, তাই তিনি যাওয়ার সময় সেখানা নিয়ে গেলেন।"

"হুঁ, বুঝেছি—যাও—"

আর্দ্দালী সরিয়া গেল।

অসম্ভব স্পর্দ্ধা—

মিলা দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—অমূল্যের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে এতটা বাড়িতে দেওয়া পিতারই যে শুধু অন্যায় হইয়াছে তাহা নহে, তাহারও অন্যায় হইয়াছে।

মিলা উঠিয়া দাঁড়াইল—এখনও ব্যবস্থা করা যায়—এখনও অমূল্যের উচ্চ লালসা বিনষ্ট করা যাইতে পারে,—পিতাকে এ সকল কথা জানানো দরকার—।

মিলা বাহির হইল।

বৈঠকখানা ঘরে ভবেশ চৌধুরী নাই, তাঁহার আর্দ্দালী জানাইল তিনি নিজের ঘরে গিয়াছেন।

এ সময়ে নিজের ঘরে—মিলা দাঁড়াইল। শরীর খারাপ না হইলে পিতা এমন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যান না। নিশ্চয়ই তাঁহার শরীর খারাপ সেজন্য তিনি বিশ্রামের জন্য নিজের ঘরে গিয়াছেন, এ সময়ে বিরক্ত করা কি মিলার উচিত হইবে?

সে ফিরিল, আবার কি ভাবিয়া অগ্রসর হইল।

ঘরের ভিতর টেবলের উপর আলো জ্বলিতেছে—পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখা গেল। এই আলোটী ভবেশ চৌধুরী লেখাপড়ার কাজের সময় ব্যবহার করেন, অন্য সময় দেয়ালের আলো অতি মৃদুভাবে জ্বলে। উজ্জ্বল ভাবে এই আলোটী জ্বলিতে দেখিয়া মিলা বুঝিল তিনি শয়ন করেন নাই, —আস্তে আস্তে সে তখন পর্দ্দা সরাইল—

ভবেশ চৌধুরী একখানা পত্র পড়িতেছেন—

মিলা সশব্দে প্রবেশ করিল—"আপনার কাছে আমার একটা দরকার আছে বাবা, খুব বেশী দরকার সেজন্যে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি আপনার এই ঘরেই—"

হঠাৎ যেন ভবেশ চৌধুরী অত্যন্ত বেশী রকম সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন দেখা গেল, তাঁহার হাতের পত্রখানা একখানা বইয়ের নিচে চাপা দিয়া ফেলিয়া তিনি মিলার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার সেই বিবর্ণ মুখ চোখ দেখিয়া মিলা স্তম্ভিত হইয়া গেল, পিতার এমন মুখ সে কোনদিন দেখে নাই।

মিলা অগ্রসর হইয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইল, উৎকণ্ঠায় সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হয়েছে বাবা—?"

ভবেশ চৌধুরী মাথা নাড়িলেন, শুষ্ক হাসির এতটুকু রেখা

অধরোষ্ঠে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কই কিছুই তো হয়নি মা।"

উৎকণ্ঠিতা মিলা বলিল, "কিছু হয়েছে বই কি বাবা, আপনার মুখ চোখের চেহারা দেখে জানা যাচ্ছে আপনি রীতিমত অসুস্থ। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কেন লেখাপড়ার কাজ করছেন বাবা, উঠুন, শুয়ে পড়ুন।"

ভবেশ চৌধুরী বলিতে গেলেন, তিনি মোটেই অসুস্থ নন, বেশ ভালো আছেন—

কিন্তু মিলা সে কথা বিশ্বাস করিল না, সে জোর করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বিছানায় শোয়াইল—টেবলের উজ্জ্বল আলো নিভাইয়া দেয়ালের সবুজ মৃদু আলোটা জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহার মাথার কাছে একখানা চেয়ার টা নিয়া বসিল, বলিল, "আমি বেশ বুঝছি বাবা, অতিরিক্ত খাটনি খেটেই আপনার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি খানিকটা চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকুন দেখি, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।"

বাধ্য হইয়াই ভবেশ চৌধুরী চক্ষু মুদিলেন। এইটুকু স্নেহের স্পর্শ পাইয়া তাঁহার জ্বালাতুর মন যেন জুড়াইয়া গেল, তিনি সম্পূর্ণভাবে মিলার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলেন।

মিলা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, আজ অনেকদিন পরে সে পিতার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিল।

সেই চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে—এ পরিবর্ত্তন তো এতকাল তাহার চোখে পড়ে নাই। এত জীর্ণ শীর্ণ—এমন কালো হইয়া গেছেন, মিলা এতকাল ইহা দেখে নাই?

কর্ম্মঠ পরিশ্রমী তাহার পিতা, কোনদিন অলসভাবে থাকিতে পারেন নাই। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম,

ইহাতে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে না তো কি? এতটুকু বিশ্রাম নাই, নিজের উপরও এতটুকু দৃষ্টি নাই— কেবল কাজ আর কাজ।

মিলার চোখে জল আসে,—

নিজের উপরও রাগ হয় কম নয়। পিতাকে দেখা কি তাহারও কর্তব্য ছিল না, তাহার মত মেয়ে থাকিতে কোন পিতার সমস্ত ভার চাকরদের উপর থাকে? নিজের সুখ সুবিধা, নিজের আরাম শান্তি লইয়া সে দিনরাত এমন ব্যাপৃত থাকে যে পিতার কথা ভাবিবার তাহার এতটুকু সময়ই হয় না। আজও সে নিজের স্বার্থের জন্যই আসিয়াছিল— নচেৎ জানিতেও পারিত না পিতার কি হইয়াছে, তিনি কোথায়?

দেয়ালে বিলম্বিত মায়ের প্রকাণ্ড বড় ছবিটার পানে তাহার চক্ষু পড়িল—।

মিলা মনে মনে প্রণাম করিল, পিতার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিল—।

পিতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আর একবারও চোখ মেলেন নাই, মিলা যেভাবে তাঁকে শোয়াইয়া দিয়াছিল, এখনও সেইভাবে শুইয়া আছেন। মিলা আস্তে আস্তে উঠিল—অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

"মিলা—"

অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, পিতা তাহা হইলে ঘুমান নাই, নীরবে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিলেন। মিলা ফিরিল—।

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে মা, একটু বসো—

মিলা ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল, বলিল, "এখন এই অসুস্থ অবস্থায় কথা না বলে বরং পরে বললে হতো না বাবা—"

ভবেশ চৌধুরী হাসিলেন ; তখনও তাঁহার মুখের সেই বিবর্ণতা সম্পূর্ণ-রূপে দূর হয় নাই।

বলিলেন, "পাগল,—আমার অসুখ কোথায়—দেহে না মনে? এত-কালের মধ্যে কোনদিন আমার অসুখ হতে দেখেছো মিল,—কোনদিন বসে থাকতে দেখেছো, বিশ্রাম নিতে দেখেছো—?"

মিলা রাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু নেওয়াই আপনার কি উচিত ছিল না বাবা?"

ভবেশ চৌধুরী দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তারও আগে ভাবো—কেন নেব। আমার সুস্থ শরীর কাজ করার প্রচুর শক্তি আছে, আমি কেন বিশ্রাম নেব, দিন আমি বিনা কাজে কাটাব কি করে? বলবে বই পড়ব—নানা জ্ঞান আহরণ করব, কিন্তু গ্রন্থকীট হয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে না মিল, নেহাৎ যেটা না পড়লে চলে না, আমি তাই পড়ি। আমি জানি যারা কেবল পড়েই যায় তারা হয় কেবল গ্রন্থকীট, তারা কর্ম্মী হতে পারে না, বরং তাদের কাজের যেটুকু শক্তি তারা নিয়ে আসে, তাও নষ্ট করে ফেলে।—না, আমি বিশ্রাম নিতে পারি নে মিল, যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ আমি কাজ করে যাব, একঘণ্টা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম করতে গেলে আমি মরে যাব।"

মিলা চুপ করিয়া রহিল,—একটু পরে বলিল, "আপনার যা খুসি তাই করুন, যাতে মন ভালো থাকে—"

সে থামিল, কথা শেষ করিল না।

ভবেশ চৌধুরী হাতখানা চোখের উপর চাপা দিলেন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মন যাতে ভাল থাকে, শরীর যাতে সচল থাকে, ভালো থাকে, তা অবশ্যই করতেই হবে বই কি?"

চুপ করিয়া খানিকক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আ একটা কথা বলতে চাচ্ছি মিল—ধর—আমি যদি হঠাৎ ম যাই—"

মিলা যেন চমকাইয়া উঠিল—কারণ এ কথা সে কোনদিন শুনে না কোনদিন ভাবে নাই; তাহাদের এ সংসার সর্ব্বপ্রযত্নে মরণে কথাটাকেই এড়াইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই সে জিজ্ঞাসা করিল, "f বলছেন বাবা—?"

ভবেশ চৌধুরী বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন, "যদি আমি মরে যাই- সেই কথাটা বলছি।"

মিলা অকস্মাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিল—"না না, ও কথা বলবেন না বাব ওসব কথা আমি সইতে পারি নে।"

হাতখানা তাহার কোলের উপর ছড়াইয়া দিয়া ভবেশ চৌধু বলিলেন, "কিন্তু এতো মিথ্যা কথা নয় মিল, কিছু নয় বলে একে ে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, এ সত্যকে যে মেনে নিতেই হবে। তুমি ে কথা ভুলতে চাইলেও মৃত্যু তো ভুলবে না মা।"

মিলা মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর পিতার হাতখানা দু হাতে তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর চাপা দিয়া সে উচ্ছ্বসিতভা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

"মিল—মিল—মা—আমার—"

ভবেশ চৌধুরী আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন, ধড়ফড় করিয়া উঠি বসিয়া তিনি মিলার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরিলেন,—তাহার পর অত্য ক্লান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া দুইহাত নিজের মুখে চাপা দিলেন।

প্রায়শ্চিত্তের দিন আগাইয়া আসিয়াছে—

কে যেন তাঁহার মনের মধ্যে গর্জন করিয়া বলিল—ভবেশ চৌধুরী শিহরিয়া উঠিলেন।

যখন তাঁহার বাহ্যশক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন মিলা তাঁহার কপালের উপর হাতখানা রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিতেছে—"আপনি যাই বলুন বাবা আমি বেশ বুঝতে পারছি স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনও খারাপ হয়ে পড়েছে, দেহের সঙ্গে মনেরও বিশ্রাম করা এখন দরকার। আপনি না যেতে চাইলেও আমি জোর করে আপনাকে গোপালপুরে নিয়ে যাব। গ্রামের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে মাসখানেক কাটাতে পারলে আপনার মন আর শরীর দুই-ই ভালো হবে।"

ভবেশ চৌধুরী ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই—তাই হবে মিল, আমি আমার ভার তোর হাতেই ছেড়ে দিলুম, তোর হতভাগ্য মহাপাপী বাপকে তুই রক্ষা কর মা, আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে তোর কোলে ঘুমুতে দে।"

হঠাৎ মাঝে মাঝে পিতা কেন যে এরকম অসংলগ্ন সব কথা বলেন তাহা মিলা বুঝে না—আজও বুঝিল না।

২৩

যদুনাথ চাহিয়াছিলেন জয়ন্ত তাঁহার দৌহিত্রীকে বিবাহ করে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম প্রস্তাবেই মাথা নাড়িল।

"বিয়ে,—বিয়ে তো আমি করব না চক্রবর্ত্তী মশাই—বিয়ে করে সংসার পাতানোর ইচ্ছে আমার মোটেই নেই।"

যদুনাথ আহত হইলেও বলিলেন, "বিয়ে তুমি করবে তা আমি জানি, সঙ্গে সঙ্গে এও জানি আমার নাতনীটি কালো বলে তাকে তুমি বিয়ে

করতে চাচ্ছো না। কিন্তু কালো হলেও জেনো—তার বাপের বা আমার যা কিছু আছে, ওই মেয়েকে যে বিয়ে করবে সে সব পাবে।"

জয়ন্ত মাথা নাড়িল, হো হো করিয়া হাসিল, বলিল, "আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না। মেয়ে কালোই হোক আর ফরসাই হোক, কিছু পাই আর না পাই, তাতে আমার এমন কিছু আসবে যাবে না, আসল কথা—আমি বিয়ে করবনা ঠিক করেছি।"

যদুনাথ তীব্রনেত্রে জয়ন্তের পানে তাকাইলেন—সেদিনে উর্ম্মির নামে টাকা পাঠানোর কথাটা মনে হইয়াছিল,—সেই কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি সামলাইয়া লইলেন।

উর্ম্মি নামে ভট্টাচার্য্যের কলিকাতায় এমন কেহ আছে যাহাকে সে টাকা পাঠাইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানিয়াছে, কিন্তু উর্ম্মি যে কে তাহা কেহই জানে না, সে সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল সকলেরই আছে।

অমূল্যের কাছে উর্ম্মির পরিচয় অজ্ঞাত রহিল না।

এই মেয়েটী ভিন্ন নামে চিত্র-জগতে পরিচিতা, অমূল্য তাহাকে ছবির গায়ে দেখিয়াছে,—তাহার সহিত জয়ন্তের সম্পর্ক কল্পনা করিয়া অমূল্য মুখে হাসিল, কিন্তু অন্তর রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবস্থা কেহ দেখিল না, শিক্ষা সভ্যতা কেহ দেখিল না, দেখিল কেবল জয়ন্তের সৌন্দর্য্য—ছি,—

এ ধিক্কার সে দিল কাহাকে, উর্ম্মিকে, মিনাকে অথবা নিজেকে?

জয়ন্ত উর্ম্মির হোক, সে অধঃপাতে যাক, তাহাতে অমূল্যের এতটুকু আসে যায় না, মিনা যে জয়ন্তকে ভালবাসিয়াছে, গোপনে জয়ন্তের ফটো তুলিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছিল, এই চিন্তাই তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সে নিজেকে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারে না।

যেমন করিয়াই হোক মিলাকে তাহার পাওয়া চাই-ই, তাহাকে স্ত্রীরূপে লাভ করিতেই হইবে। অমূল্য যে স্বপ্ন দেখিয়াছে সে স্বপ্নকে সত্যরূপে গড়িতে হইবে নচেৎ তাহার জীবনেরই কোন মূল্য থাকিবে না। মিলার সৌন্দর্য্য, গুণ, শিক্ষা বা সভ্যতা কিছুই অমূল্যকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। অমূল্য জানে—টাকা থাকিলে এমন ঢের মেয়ে আসিয়া তাহার গলায় মালা দিয়া যাইবে, টাকা না থাকিলে কেহ তাহার দিকে তাকাইয়াও দেখিবে না।

অমূল্যের চাই সম্পদ—তাহার মনের স্বপ্ন সফলতা লাভ করিবে যদি মিলা তাহার হয়। তাহার সফলতার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জয়ন্ত, তাহাকে অমূল্য অবশ্যই সরাইয়া দিবে।

ভবেশ চৌধুরীকে সে পত্র লিখিয়া জানাইল—যে পূজারীকে তিনি মন্দিরের ভার দিয়াছেন, সে পূজার কাজে একেবারেই অনুপযুক্ত। একে একে তাহার অনেক দোষ ধরা পড়িয়া গেছে, সে সব জানিয়া তাহাকে এ কাজে আর রাখা চলে না। সে এখানে সমস্ত প্রজাদের জমিদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে, ছোটলোকদের ছেলেমেয়ের জন্ম নিজে বিদ্যালয় করিয়াছে, সারাদিন সেইস্থানেই সে কাটায়। পুরোহিতের নিষ্ঠা তাহার মোটেই নাই—কারণ তাহার কাজ যত ছোটলোকদের লইয়া। মন্দিরের পূজার চাল ইত্যাদি সে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থ বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী স্মৃতিদেবীকে পাঠাইয়া দেয়। স্মৃতির আসল নাম উর্ম্মি এবং তাহারই বাড়ীতে জয়ন্ত ভাড়া দিয়া বাস করিত, কাজেই তাহাকে টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য অতি সহজেই বুঝা যায়।

এই পত্রের উত্তরে ভবেশ চৌধুরী জানাইলেন তিনি শীঘ্রই ব্যবস্থা করিবেন, পূজা যেমন চলিতেছে এখন তেমনই চলুক।—

এমনই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যা বেলার ঘটনা—

বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যা,—আকাশে চাঁদখানা প্রকাণ্ড বড় সোনার থালার মত ভাসিয়া উঠিতেছে, চারিদিক ইহার মধ্যেই শুভ্র আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে।

আরতির আয়োজনে ব্যাপৃত জয়ন্ত গুণ গুণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করেছো নিকট বন্ধু, পরকে করেছ ভাই।

হঠাৎ কাণে একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল, "ঠাকুর মশাই"—চমকাইয়া জয়ন্ত চুপ করিয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া পিছনে চাহিল—।

উর্ম্মিই বটে—

উর্ম্মি—

জয়ন্তের চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল।

উর্ম্মি বারাণ্ডা হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, "হঠাৎই চলে এলুম ঠাকুর মশাই, দেখলুম বইগুলো আমার কাছেই রয়ে গেল, আপনি আর আনতে গেলেন না, কাউকে আনবার জন্যে পাঠালেনও না। বাধ্য হয়ে নিজের আসা ছাড়া উপায় রইলো না—?"

বলিতে বলিতে সে পিছনে তাকাইয়া বলিল, নিয়ে এসো বইগুলো—

আবার সে জয়ন্তের দিকে চাহিল বলিল, "এসেই খোঁজ নিয়েছি আপনার বাড়ী কোথায়, কেউ বলতে পারলে না, একজন বললে—আপনি নাকি এখানেই থাকেন তাই বইগুলো এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে নামাতে বলব বইগুলো—"

জয়ন্ত কেবলমাত্র বলিল—"রাখো—"

একটা লোকের হাতে বইগুলি পুঁটলি অবস্থায় ছিল, সেগুলি নামাইয়া একপাশে গুছাইয়া রাখিয়া সে লোকটি চলিয়া গেল।

জয়ন্ত দেখিল উর্ম্মি বারাণ্ডাতে বসিয়া পড়িল। সে ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, আরতির আয়োজনে সে আর নিজেকে একান্তভাবে নিবিষ্ট রাখিতে পারিল না—

জিজ্ঞাসা করিল—"কই, তুমি গেলে না?"

উর্ম্মি দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, "আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান?"

অপ্রস্তুত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "না, ঠিক তাড়াচ্ছিনে তোমায়, তবু অনুযোগ করছি তোমার এ কয়খানা বই নিয়ে এমন সময়ে এখানে আসা উচিত হয়নি। যদিও এসেছো আবার এখনি চলে যাওয়া উচিত।

উর্ম্মি বলিল, "যাওয়া উচিত তা আমি জানি, কিন্তু তবু আজ এই রাত্রে আমার যাওয়ার উপায় নেই। আমি ট্রেন টাইম না দেখেই এসে পড়েছি, এখানে পৌঁছে ষ্টেশানে ফিরবার ট্রেণের টাইম দেখলুম—সে ট্রেণ সাড়ে ছটায় চলে গেছে, আর একখানা আছে রাত সাড়ে তিনটের। এখন আমাকে ফিরতে গেলেও ষ্টেশানে বসে থাকতে হবে শেষরাত পর্য্যন্ত,—আর ষ্টেশানে সেই সব ছোটলোক কুলির মধ্যে—"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "না, না, সেখানে থাকা—একা মেয়েছেলে—ঠিক নয়—"

বলিতে বলিতে একটু থামিয়া চিন্তিতমুখে সে বলিল, "কিন্তু এখানে থাকাও তো ভারি মুস্কিল হবে তোমার, ঠাকুর বাড়ী, কোন মেয়েছেলে তো এখানে থাকে না, তুমি থাকবে কি করে?"

উর্ম্মি বলিল, "নাই বা রইলো মেয়েছেলে, আপনি তো থাকেন,—

আমি এখানে—এই বারাণ্ডায় বেশ থাকতে পারব এখন। ঠাকুর বাড়ীতে কোন ভয় নেই।"

চিন্তিতমুখে জয়ন্ত বলিল, "তা নয়, আমি ভয়ের কথা বলুছিনে—বলছি—"

উর্ম্মি বাধা দিয়া বলিল, "আপনার ভাববার কোন দরকার নেই। ঠাকুরবাড়ী সকলের আশ্রয় স্থান হতে পারে, এই বারাণ্ডায় কেবল আমি কেন—মুচি, মেথর, হাড়ি ডোম সবাই আশ্রয় পেতে পারে। আমাকে যদি ঘৃণিত অস্পৃশ্য ভেবে থাকেন, আমি আপনাদের ভদ্রসমাজের স্থান না পেতে পারি, দেবতার মন্দিরের বারাণ্ডায় স্থান পেতে পারি ঠাকুর মশাই—মানুষ আমায় ঘৃণা করলেও যিনি অন্তর্য্যামী দেবতা তিনি ঘৃণা করবেন না এ আশা আমি করি।"

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, চোখেও বোধ হয় জল আসিয়াছিল; জয়ন্ত মৃদু আলোকে চোখের জল দেখিতে না পাইলেও কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা বুঝিতে পারিল। অত্যন্ত ত্রস্তভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিরুপায়ভাবে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, আমি ঠিক সে কথা বলছিনে, আমি—"

উর্ম্মি আবার বাধা দিল—"না, থাক ঠাকুর মশাই, আপনাকে আর অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে প্রকৃত সত্যকে ঢাকতে হবে না। আমি যে কি তা আমি জানি—সেজন্যে আমি নিজেই সঙ্কুচিত, আমি নিজে লজ্জিত—আমি সকলের পেছনে থাকতে চাই। আপনি আমার জন্যে ভাববেন না, আমি এইখানে আজ রাতটা বসে থেকে বেশ কাটিয়ে দেব।"

জয়ন্ত বাহিরে—একেবারে উর্ম্মির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল,

"তা হতে পারে না। তুমি আজ আমার অতিথি ; অতিথি, যাই হোক—যেমনই হোক, তার সেবা করতেই হবে এবং সেই জন্যই আমিও করব। তুমি বসো, আমি আরতিটা করে নেই, তারপরে তোমার ব্যবস্থা করব। আজ যখন আমার আশ্রয়েই এসেছো—আমাকে তোমার উপযুক্ত পরিচর্য্যা করতে দিয়ো।"

উর্ম্মি চোখ তুলিয়া জয়ন্তের মুখের পানে চাহিল।

দেবতার নাম কাণেই শুনিয়াছে, দেবতা পরম করুণাময়, কেবল শুনিয়াছে মাত্র, আজ সে যেন সেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিল,—

মন্ত্রমুগ্ধা উর্ম্মি জয়ন্তের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, তাহাকে স্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিল, স্পর্শ করিবার সাহস তাহার হইল না।

কলঙ্কিনী মায়ের কন্যা,—মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে, সে সব হইতে দূরে থাকিবে।—

ঠিক এই সময়ে যদুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

খানিকক্ষণ তিনি বদ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কুটীল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি একবার শুধু মাথা দুলাইলেন—।

তাহার পর আস্তে আস্তে যেমন তিনি আসিয়াছিলেন তেমনই সরিয়া পড়িলেন, জয়ন্ত তাঁহার আগমন বা গমন কিছুই জানিতে পারিল না।

২৪

গ্রামে সত্যই হুলুস্থুল পড়িয়া গেল,—

সকাল বেলাই অনেকে মন্দিরে আসিয়া ঊর্ম্মিকে দেখিয়া গেলেন—।

অমূল্য জয়ন্তকে ডাকিয়া পাঠাইল, জয়ন্ত বলিয়া পাঠাইল—পূজা না করিয়া সে যাইতে পারিবে না।

পূজা না করিয়া যাইবে না—

অমূল্যের রোষানলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল—

"এই শিউচরণ, লোহিয়া, গিরিধারী আমার সঙ্গে এস—জরুরী দরকার,—এতটুকু দেরী করবে না—।"

অমূল্য নিজেই চলিল মন্দিরে, আজ সে যা হোক কিছু করিবেই, জয়ন্তের উপর প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে।

হুঁ, এই লোকটাকেই মিলা ভালো বাসিয়াছে—ইহারই ফটো সে ঘরে রাখিয়াছিল। হয় তো প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া ইহার মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া সে প্রণাম করিয়াছে, হাজার কাজের ফাঁকে এই ফটো দেখিয়া সে হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।

সে দেখে নাই জয়ন্তের আর্থিক অবস্থা, দেখে নাই তাহার চরিত্র কিরূপ, সে দেখিয়াছে কেবল রূপ,—সেই সৌন্দর্য্যের অধিকারীকে সে তাহার অর্ঘ্য দান করিয়াছে। তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিবে অমূল্য, সে দেখাইবে—ঊর্ম্মি যাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়াছে, সে স্খলিত চরিত্র লোক, —সে ঘৃণার পাত্র।

মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই দেখা হইল জয়ন্তের সঙ্গে,—জয়ন্ত সাজি করিয়া ফুল তুলিতেছিল—

অমূল্যকে দেখিয়া সে করধৃত গন্ধরাজের ডালটাকে ছাড়িয়া দিল—ডালটা পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

অমূল্য ডাকিল—একটু এদিকে আসুন ঠাকুর, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।"

তাহার মুখ অতি গম্ভীর, ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত—যেন এখনই বর্ষণ আরম্ভ হইবে।

জয়ন্ত নিকটে আসিল, বলিল,—"বলুন—"

তাহার শান্তভাবের পানে তাকাইয়া অমূল্যের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল, যথাসম্ভব সংযতভাবে সে বলিল, "আপনাকে আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, আপনি যান নি কেন?"

সম্পূর্ণ আদেশের স্বর; জয়ন্ত সে আদেশের সুর অগ্রাহ্য করিয়া শান্ত-কণ্ঠেই বলিল—"যাই নি কারণ আমি সকালে স্নান সেরে পূজো না করে কোথাও যাই নে—"

অমূল্য বিকৃত মুখে বলিল, "কোন সাহসে আপনি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করলেন?"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে হাসিল, বলিল, "মানুষের পরে কর্ত্তব্য পালনের আগে দেবতার পরে কর্ত্তব্য পালনের দায়ীত্ব খুব বেশী আছে বলেই আমি মনে করি। আমার কাজ ঐহিক জগৎ নিয়ে নয়, কাজেই আমি ঐহিক জগতে যিনি আমার প্রভু, তাঁর আদেশ হওয়া মাত্র পালন করতে পারি নে।"

"হুঁ—"

অমূল্য একবার তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তীব্র দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। স্পর্দ্ধা এ লোকটার বড় কম নয়—প্রথম দিনের পরিচয়ে সে তাহা

জানিয়াছে—তাহার পর ছোটোখাটো অনেক সংখ্যাতে সে কথা ভালো রূপে সে বুঝিয়াছে।

অমূল্য কোনদিন তাহার সামনে জোর করিতে পারে নাই, নিজের পৌরুষত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। আড়ালে সে অনেক আস্ফালন করিয়াছে, সামনে আসিয়া সকল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই দুর্ব্বলতা সে বোধ করিয়াছে জয়ন্ত সরিয়া গেলে—তখনই সে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত বড় কম নয়।

আজ সে দুর্ব্বলতা দেখাইবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে, তাই সগর্জ্জনে বলিল, "কিন্তু এ কথা মনে রেখো ভশ্চায, এই মানুষই তোমায় দেবতার পূজোর অধিকার দিয়েছে, এই মানুষই আবার সে অধিকার তোমার হাত হতে কেড়ে নিতে পারে। তুমি মুখে ইহজগৎ নশ্বর বলে যতই জারিজুরী দেখাও না কেন—আমরা জেনেছি তোমার সব মিথ্যে, তুমি ধাপ্পাবাজি করছো—সমস্ত মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজ স্বচ্ছন্দে করে যাচ্ছো। আজ আমরা সে ধাপ্পাবাজিতে আর ভুলব না ভশ্চায, তোমার সত্য পরিচয়ই আমরা পেয়েছি।

মন্দিরে পূজো করবার অধিকার তোমার এই মুহূর্ত্ত হতে ফুরালো, তুমি মনে রেখো—তুমি দেবতার পূজারী আর নও—"

ফিরিয়া দারোয়ানদের পানে চাহিয়া অমূল্য আদেশ দিল, "মন্দিরের দরজায় তালাচাবি লাগাও—আর একজন গিয়ে চক্রবর্ত্তী মশাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও।"

দুইজন বারাণ্ডায় উঠিয়া গেল।

জয়ন্তের চোখের সামনে ঠাকুর ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত কেবল একটু হাসিল মাত্র—

মানুষের ঔদ্ধত্য, ধনীর অহঙ্কার, দরিদ্রকে পীড়ন—এ সব তো নিত্যই সে দেখিতে পায়, ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, নূতনত্বও নাই। জয়ন্ত প্রস্তুত হইয়াই আছে, সে জানে তাহাকেও ইহার জের টানিতে হইবে—। সে জানিত এ ঢেউ আসিবে অন্যদিক হইতে, স্বয়ং ভবেশ চৌধুরীই কোনদিন তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবেন, তাঁহার কর্ম্মচারী হইয়া অমূল্য যে ক্ষমতার অহঙ্কার দেখাইতে আসিবে তাহা সে ভাবে নাই।

তাহার মুখের সে হাসি অমূল্যকে যেন চাবুক মারিল,—ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাসছো যে—"

ধীরকণ্ঠে জয়ন্ত বলিল, "হাসছি মানুষের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে—"

"ক্ষমতার অপব্যবহার—"

অমূল্যের কণ্ঠ ক্রোধে রুদ্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত বলিল, "তা বই আর কি। ছিলুম আপনি—হয়েছি তুমি, কোন অতর্কিত মুহূর্তে তুই পর্য্যায়ে নেমে পড়ব তাই বা কে জানে।"

অমূল্য বলিল, "এতেই বোঝ—মানুষের কাজই যাকে স্বর্গ হতে নামিয়ে নরকে নিয়ে আসে; যাকে একদিন অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়, তাকেই পায়ের তলায় পিষে মারে।"

জয়ন্ত হাসিল—

বলিল, "কিন্তু ম্যানেজার বাবু, গোড়াতেই ভুল করেছেন, আমাকে তুই বলতেও পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ঠাকুর ঘরের দরজায় চাবি দেবার অধিকার আপনার নেই, আমার হাত হতে পূজোর অধিকার নিয়ে চক্রবর্ত্তী মশাইকে দেওয়ার অধিকারও আপনার নেই।"

অমূল্য গর্জ্জিয়া উঠিল—"নেই—?"

শান্তকণ্ঠে জয়ন্ত বলিল,—"না নেই। যদি প্রভু ভৃত্য সম্পর্কটা নিয়ে এসে থাকেন—ভুল করেছেন। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কার ভৃত্য—আপনিই বা কার মনিব? মন্দিরের পূজারী কারও ভৃত্য নয়, সে কারও আদেশ শুনে চলতে বাধ্য নয়, হুকুম দেওয়ার আগে এ কথাটা মনে করবেন। আর একটা কথা—আপনার কথা শুনতে আমি বাধ্য নই,—যে নিজে ভৃত্য সে অপরকে হুকুম করতে পারে না। আপনার মনিব আমায় নিযুক্ত করেছেন, আমার কাজের জবাব দেব তাঁর কাছে—আপনার কাছে নয়। বরং আমি আপনাকে হুকুম করছি আপনি আমার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না আমার অনুমতি ব্যতীত, কোনও নিষ্ঠাহীন লোককে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে আমি মত দিতে পারি নে।"

স্তম্ভিত অমূল্য চাহিয়া রহিল।

প্রথমটায় সে যেন বুঝিতে পারে নাই জয়ন্ত তাহাকে কতখানি অপমান করিল, অল্পে অল্পে সে হৃদয়ঙ্গম করিল জয়ন্ত তাহাকে কি বলিয়াছে।

একবার সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল—বাহিরের লোক কেহ ভিতরে নাই—হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানেরা আছে, তাহারা বাংলা ভাষা খুব ভালো বুঝেনা তাই রক্ষা।

তাহারই চোখের সামনে জয়ন্ত বারাণ্ডায় উঠিয়া গেল, দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল—"তালা খুলে দাও—"

তাঁহার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া দ্বারোয়ান ইতস্ততঃ করিতেছিল, অমূল্য প্রচণ্ড ধমক দিল,—"না, তালা বন্ধ থাকবে। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী আজ হতে পূজো করবেন—"

ক্রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া জয়ন্ত বলিল, "কখনো নয়, আমি এ মন্দিরে আমার

কুলদেবতা পূজোর অধিকার কাউকে দেব না, আমি নিজে পূজো করব।"

একটানে সে শিকলশুদ্ধ তালা উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিল।—

অত মোটা শিকলটাকে সবশুদ্ধ উপড়ানো যে কতখানি শক্তির পরিচায়ক তাহা কল্পনা করিয়া অমূল্যের মাথা ও বুক শির শির করিয়া উঠিল।

এই সময়ে দ্বারোয়ানের সহিত যদুনাথ আসিয়া পৌছাইলেন—

"কি ব্যাপার ম্যানেজার বাবু, দ্বারোয়ান আমাকে গিয়ে যা বললে—"

বলিতে বলিতে তিনি স্তব্ধ হইয়া গিয়া বারাণ্ডার উপরে জয়ন্তের পানে তাকাইলেন। অমূল্য বলিল, "আপনাদের ভশ্চাযের শক্তিটা দেখুন, তালাশুদ্ধ শিকল উপড়ে ফেলেছে—"

যদুনাথ এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিলেন—

অমূল্য বলিল, "শুনলুম এখানে—এই পবিত্র ঠাকুর বাড়ীতে এক কসবী এসে রয়েছে, এত বড় ভ্রষ্টাচার ভশ্চায চালাতে পারে কিন্তু—"

"চুপ চুপ"—

জয়ন্ত দ্রুত নামিয়া আসিল—অমূল্যের ঠিক সামনে দাঁড়াইতেই ভীত অমূল্য দুই পা পিছাইয়া গেল। সগর্জ্জনে জয়ন্ত বলিল, "অনেক কথা বলেছো ম্যানেজার, এই অপবিত্র কথাটা আর উচ্চারণ করো না। মন্দিরে এসেছে আমার অতিথি—সে কসবী নয়, সে তোমার মায়ের জাতি,—তোমার মা; মাতৃ জাতির প্রতি সম্মান করে কথা বলতে শেখো পাপিষ্ঠ—

পিছন ফিরিয়া সে ডাকিল,—"উর্ম্মি—"

পাশের ছোট ঘরটা হইতে উর্ম্মি বাহির হইয়া আসিল।

শান্তকণ্ঠে জয়ন্ত বলিল,—"না নেই।
এসে থাকেন—ভুল করেছেন। আমি প্রভু
কার ভৃত্য—আপনিই বা কার মনিব? মন্দি
নয়, সে কারও আদেশ শুনে চলতে বাধ্য নয়,
কথাটা মনে করবেন। আর একটা কথা—আ
বাধ্য নই,—যে নিজে ভৃত্য সে অপরকে হু
আপনার মনিব আমায় নিযুক্ত করেছেন, আমা
কাছে—আপনার কাছে নয়। বরং আমি ব
আপনি আমার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন
ব্যতীত, কোনও নিষ্ঠাহীন লোককে মন্দিরে প্রবে
মত দিতে পারি নে।"

স্তম্ভিত অমূল্য চাহিয়া রহিল।

প্রথমটায় সে যেন বুঝিতে পারে নাই জয়ন্ত
অপমান করিল, অল্পে অল্পে সে হৃদয়ঙ্গম করিল
বলিয়াছে।

একবার সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল—বাহি
ভিতরে নাই—হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানেরা আছে, তাহারা
ভালো বুঝেনা তাই রক্ষা।

তাহারই চোখের সামনে জয়ন্ত বারাণ্ডায় উঠিয়া গে
ডাকিয়া বলিল—"তালা খুলে দাও—"

তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দ্বারোয়ান ইতস্ততঃ করিতেছি
ধমক দিল,—"না, তালা বন্ধ থাকবে। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
পূজো করবেন—"

রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া জয়ন্ত বলিল, "কখনো নয়, আমি

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—

ঊর্মি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "আমার জন্তে আপনি এত বড় কলঙ্কটা মাথায় নিলেন ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত বলিল, "না হলে উপায় ছিল না। আমি জানি তুমি অভিনেত্রী, আমি জানি তুমি কলঙ্কিনী মায়ের মেয়ে, আমি জানি তোমার জীবনের ইতিহাসে জেনেছি তুমি নারী-হত্যাকারীর মেয়ে, তবু—তবু এ কথা না বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। তোমায় এরা অনেকে পর্দার গায়ে দেখেছে—তবু তোমার পরিচয় জানে না যেমন আমি জানি। ওদের তাই জানিয়ে দিলুম তুমি আমার বাল্যে বিবাহিতা স্ত্রী, অনেককাল পরে অনেক খুঁজে আমার সন্ধান পেয়ে তুমি এসেছো আমারই কাছে।"

ঊর্মি নিরুপায়ভাবে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল,—"এখন উপায়?"

জয়ন্ত দুই পা অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "উপায় আবার কি? তুমি যেমন এসেছো তেমনি ফিরে চলে যাবে, আমি তোমায় ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব, এইটুকুর সম্পর্ক মাত্র তোমার সঙ্গে এখনো আমার রয়েছে।"

ঊর্মি কান্নাঢালা সুরে বলিল, "তারপর—আপনার উপায়—? এঁরা যে রকম ভাব দেখালেন তাতে—"

হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল, চোখের জল সামলাইবার জন্যই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

জয়ন্ত হাসিল—"আমার উপায়? আমার জন্যে কোনদিন কাউকে ভাবতে হবে না, নিজের জন্যে যা করবার তা নিজেই করব। মায়ের মৃত্যুর পর আমি যেদিন আসি, সেদিন আমি ছিলুম কপর্দকহীন এক

শান্তকণ্ঠে জয়ন্ত বলিল,—"না নেই। যদি প্রভু ভৃত্য সম্পর্কটা নিয়ে এসে থাকেন—ভুল করেছেন। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কার ভৃত্য—আপনিই বা কার মনিব? মন্দিরের পূজারী কারও ভৃত্য নয়, সে কারও আদেশ শুনে চলতে বাধ্য নয়, হুকুম দেওয়ার আগে এ কথাটা মনে করবেন। আর একটা কথা—আপনার কথা শুনতে আমি বাধ্য নই,—যে নিজে ভৃত্য সে অপরকে হুকুম করতে পারে না। আপনার মনিব আমায় নিযুক্ত করেছেন, আমার কাজের জবাব দেব তাঁর কাছে—আপনার কাছে নয়। বরং আমি আপনাকে হুকুম করছি আপনি আমার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না আমার অনুমতি ব্যতীত, কোনও নিষ্ঠাহীন লোককে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে আমি মত দিতে পারি নে।"

স্তম্ভিত অমূল্য চাহিয়া রহিল।

প্রথমটায় সে যেন বুঝিতে পারে নাই জয়ন্ত তাহাকে কতখানি অপমান করিল, অল্পে অল্পে সে হৃদয়ঙ্গম করিল জয়ন্ত তাহাকে কি বলিয়াছে।

একবার সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল—বাহিরের লোক কেহ ভিতরে নাই—হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানেরা আছে, তাহারা বাংলা ভাষা খুব ভালো বুঝেনা তাই রক্ষা।

তাহারই চোখের সামনে জয়ন্ত বারাণ্ডায় উঠিয়া গেল, দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল—"তালা খুলে দাও—"

তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দ্বারোয়ান ইতস্ততঃ করিতেছিল, অমূল্য প্রচণ্ড ধমক দিল,—"না, তালা বন্ধ থাকবে। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী আজ হতে পূজো করবেন—"

ক্রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া জয়ন্ত বলিল, "কখনো নয়, আমি এ মন্দিরে আমার

লদেবতা পূজোর অধিকার কাউকে দেব না, আমি নিজে পূজো রব।"

একটানে সে শিকলশুদ্ধ তালা উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফলিল।—

অত মোটা শিকলটাকে সবশুদ্ধ উপড়ানো যে কতখানি শক্তির রিচায়ক তাহা কল্পনা করিয়া অমূল্যের মাথা ও বুক শির শির করিয়া ঠিল।

এই সময়ে দ্বারোয়ানের সহিত যদুনাথ আসিয়া পৌছাইলেন—

"কি ব্যাপার ম্যানেজার বাবু, দ্বারোয়ান আমাকে গিয়ে যা বললে—"

বলিতে বলিতে তিনি স্তব্ধ হইয়া গিয়া বারাণ্ডার উপরে জয়ন্তের পানে চাকাইলেন। অমূল্য বলিল, "আপনাদের ভশ্চাযের শক্তিটা দেখুন, তালাশুদ্ধ শিকল উপড়ে ফেলেছে—"

যদুনাথ এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিলেন—

অমূল্য বলিল, "শুনলুম এখানে—এই পবিত্র ঠাকুর বাড়ীতে এক কসবী এসে রয়েছে, এত বড় ভ্রষ্টাচার ভশ্চায চালাতে পারে কিন্তু—"

"চুপ চুপ"—

জয়ন্ত দ্রুত নামিয়া আসিল—অমূল্যের ঠিক সামনে দাঁড়াইতেই ভীত অমূল্য দুই পা পিছাইয়া গেল। সগর্জ্জনে জয়ন্ত বলিল, "অনেক কথা বলেছো ম্যানেজার, এই অপবিত্র কথাটা আর উচ্চারণ করো না। মন্দিরে এসেছে আমার অতিথি—সে কসবী নয়, সে তোমার মায়ের জাতি,—তোমার মা; মাতৃ জাতির প্রতি সম্মান করে কথা বলতে শেখো পাপিষ্ঠ—"

পিছন ফিরিয়া সে ডাকিল,—"উর্ম্মি—"

পাশের ছোট ঘরটা হইতে উর্ম্মি বাহির হইয়া আসিল।

চওড়া লাল পাড় শাড়িটা তাহার পরণে—চুলগুলি রুক্ষ, ভোরবেলাই সে স্নান করিয়া আসিয়াছে, খোলা চুল তাহার জানু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত বলিল, "দাঁড়াও, এদের সামনে তোমার সত্যিকার পরিচয় দিতে দাও। এরা তোমার সম্বন্ধে অতি কুৎসিত ধারণা করেছে, এদের জানতে দাও—তোমায় এরা যা ভাবে তুমি তা নও। তোমার আমার সঙ্গে যে কুৎসিত ধারণা এরা করেছে তা সম্পূর্ণ ভুল, সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্পষ্ট বাক্যে এদের জানাও—তুমি আমার স্ত্রী, তোমাকে আমি বিবাহ করেছি তুমি তাই আমার কাছে এসেছো।"

উর্ম্মির চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া তখনই নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে একটা থামে ভর দিল।

জয়ন্ত মন্দিরের দিকে ফিরিল, অকুণ্ঠপদে দরজা খুলিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিল, পিছন ফিরিয়া আর একবারও চাহিল না।

২৫

"এ কি করলেন ঠাকুর মশাই—এ কি করলেন—"

উর্ম্মি জয়ন্তের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল "আমি কলঙ্কিনী মায়ের মেয়ে—আমি—"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার মতে আমি ভালোই করেছি, এ রকম করা ছাড়া তোমাকেও বাঁচাতে পারতুম না, নিজেও বাঁচতুম না। তুমি একা সন্ধ্যার পর কলকাতা হতে আমার কাছে এসেছো—এর আগে আমি তোমায় টাকা পাঠিয়েছি, তুমি আমায় পত্র দিয়েছো—এ সবগুলো জড়িয়ে ব্যাপারটা কি রকম গড়ে উঠেছে তা যদি জানতে তুমি—"

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—

ঊর্ম্মি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "আমার জন্যে আপনি এত বড় কলঙ্কটা মাথায় নিলেন ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত বলিল, "না হলে উপায় ছিল না। আমি জানি তুমি অভিনেত্রী, আমি জানি তুমি কলঙ্কিনী মায়ের মেয়ে, আমি কাল তোমার জীবনের ইতিহাসে শুনেছি তুমি নারী হত্যাকারীর মেয়ে, তবু—তবু এ কথা না বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। তোমায় এরা অনেকে পর্দ্দার গায়ে দেখেছে—তবু তোমার পরিচয় জানে না যেমন আমি জানি। ওদের তাই জানিয়ে দিলুম তুমি আমার বাল্যে বিবাহিতা স্ত্রী, অনেককাল পরে অনেক খুঁজে আমার সন্ধান পেয়ে তুমি এসেছো আমারই কাছে।"

ঊর্ম্মি নিরুপায়ভাবে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল,—"এখন উপায় ?"

জয়ন্ত দুই পা অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "উপায় আবার কি ? তুমি যেমন এসেছো তেমনি ফিরে চলে যাবে, আমি তোমায় ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে ফিরে আসব, এইটুকুর সম্পর্ক মাত্র তোমার সঙ্গে এখনো আমার রয়েছে।"

ঊর্ম্মি কান্নাঢালা সুরে বলিল, "তারপর—আপনার উপায়—? এঁরা যে রকম ভাব দেখালেন তাতে—"

হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল, চোখের জল সামলাইবার জন্যই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

জয়ন্ত হাসিল—"আমার উপায় ? আমার জন্যে কোনদিন কাউকে ভাবতে হবে না, নিজের জন্যে যা করবার তা নিজেই করব। মায়ের শ্রাদ্ধের পর আমি যেদিন আসি, সেদিন আমি ছিলুম কপর্দ্দকহীন এক

ভিখারী, একটী পয়সা আমার ছিল না যে ক্ষুধার সময় মুড়ি কিনে খাব। তোমার বাড়ী ভাড়ার জন্যে তোমায় আমার বড় প্রিয় বইগুলো দিয়ে এসেছিলুম, নিজের ক্ষমতায় পৈত্রিক স্বত্ব আদায় করে নিয়েছি। আজ যদি এখান হতে বিদায় নিতে হয়—নেব, আবার নূতন উপায় করব, নিজের কাজ ঠিক করে নেব। আমার জন্যে কাউকে কোনদিন ভাবতে হবে না—মনে রেখো আমি মেয়ে নই—আমি পুরুষ। দীনতা নম্রতা আমাদের ধর্ম্ম নয়, পৌরুষত্ব আমাদের ধর্ম্ম,—আমাদের অ[illegible]ঙ্কার।"

অন্যমনস্কের মতই সে চলিয়া গেল। তখন যদি ফিরি[illegible] চাহিত দেখিত ঊর্ম্মি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

উপায় ছিল না—সত্যই কি উপায় ছিল না? জয়ন্ত নিজেকে কেন বাঁচাইল না, কেন বলিল না ঊর্ম্মি নিজেই আসিয়াছে,তাহার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে? ঊর্ম্মির জন্ম কলঙ্কের মধ্যে, ঊর্ম্মি কলঙ্ককে ভয় করে না। ঊর্ম্মি সমাজের একজন নয়, সে সমাজের বাহিরে রহিয়াছে—থাকিবেও।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে নিজেই ঠাণ্ডা হইল, নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল।

জয়ন্তের খোঁজ লইয়া জানিল সে রন্ধন গৃহে গিয়াছে। দরজার পথে উঁকি মারিয়া দেখিল জয়ন্ত ভাত নামাইয়া কি একটা তরকারী চড়াইতেছে।

ঊর্ম্মি ডাকিল, "আমি যাচ্ছি ঠাকুর মশাই—"

"যাচ্ছো—" জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল—"মানে?"

ঊর্ম্মি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "এর মানে বোঝা এমন কিছু [illegible] নয় ঠাকুর মশাই, অতটা লেখাপড়া শিখেছেন, এই সামান্য কথাটার মানেও

আপনাকে বুঝাতে হবে? মানেটা হচ্ছে—বেলা দশটায় যে ট্রেণখানা যাবে, আমি সেইটেতেই যেতে চাই।"

জয়ন্ত মাথা নাড়িল—"না খাইয়ে আমি তোমার যেতে দিতে পারিনে উর্ম্মি—ওতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। কাল রাত্রে তো জলস্পর্শও করনি—"

গৃহস্থের অমঙ্গল—উর্ম্মি হাসিয়া ফেলিল, বলিল "আপনি তো গৃহস্থ নন ঠাকুর মশাই, যেদিন গৃহস্থ হবেন সেদিন আমি এসে অন্ততঃপক্ষে একটু গুড় মুখে না দিয়েও চলব না। কিন্তু আজ থাক ঠাকুর মশাই—আমি এই ট্রেণেই ফিরব, আপনি বাইরে আসুন—আমি প্রণাম করে যাই।"

জয়ন্ত এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তরকারীর কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "তবে চল, আগে তোমায় ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

ব্যস্ত হইয়া উর্ম্মি বলিল, "ওকি করলেন—তরকারী নামিয়ে রাখলেন কেন? আমি একাই যেতে পারব, আপনাকে আর সঙ্গে যেতে হবে না।"

জয়ন্ত মাথা নাড়িল—"তা হয় না—চল—"

রান্নাঘরের শিকলটা তুলিয়া দিয়া সে উর্ম্মিকে লইয়া বাহির হইল।

পথে অনেকেরই সঙ্গে দেখা হইল, জয়ন্তের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইয়া কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সমস্ত পথ উভয়েই নির্ব্বাকে অতিবাহিত করিল। ষ্টেশনে তাহারা যখন পৌঁছাইল তখন ট্রেণ আসিবার আর খুব বেশী সময় ছিল না।

টিকিট কাটিয়া আনিয়া জয়ন্ত বলিল, "এরই দুইঘণ্টা পরে আর একখানা ট্রেণ ছিল, সেটাতে গেলে আর কোন কথা চোলতো না। আমি এই কথাটা ভুলব না, তুমি কিছু না খেয়ে চলে গেলে, এতে আমার মায়ের আত্মা সুখী হতে পারবে না।"

কেবল এই—কেবল এই জন্যই জয়ন্ত উর্ম্মিকে মনে রাখিবে।

উর্ম্মির চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে অন্যদিকে চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল—"সামান্য কথা, দুদিনে ভুলে যাবেন—"

জয়ন্ত কেবল মাথাটা কাত করিল—

"আচ্ছা উর্ম্মি, আমার মা তোমাকে ভালোবাসতেন—না—?"

উর্ম্মি কেবল মাত্র বলিল, "ভালোবাসা নয়—দয়া।"

জয়ন্ত কেবল মাত্র বলিল—"হুঁ—"

সিগনল দিয়াছে—ট্রেণ এখনই আসিবে।

উর্ম্মি বলিল—"একটা কথা বলে যাই ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত অন্যমনস্কভাবে বলিল, "-- কি ?—"

উর্ম্মি নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া অর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনার এখানকার কাজ যদি ফুরিয়ে যায়, আপনি আমার কাছে যাবেন। আমার মা বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব, আমি ঠাকুর বাড়ী করব, আপনি সেখানে চিরকালের পূজারী হয়ে থাকবেন। বলুন ঠাকুর মশাই—যাবেন।"

জয়ন্ত স্তব্ধনেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—মুহূর্ত্ত পরে উত্তর দিল, "আমি তোমায় কথা দিতে পারিনে উর্ম্মি—যদি কলকাতায় ফিরি তোমার ঠাকুরবাড়ী তৈরী হয়, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়—আমি যেতে চেষ্টা করব।"

ট্রেণ আসিয়া পড়িল।

জয়ন্ত উর্ম্মিকে মেয়েদের কামরায় উঠাইয়া দিল, এক মিনিট মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায় উর্ম্মি জানালাপথে চাহিয়া রহিল—।

ট্রেণ চলিয়া গেল—শ্রান্তপদে জয়ন্ত ফিরিল।

কতটুকু সময়, এই সময়টুকুর মধ্যে কত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। জয়ন্ত মনের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ বিস্মিত হইয়া গেল।

এ কে—কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল—তাহার জীবনের একটা স্মরণীয় অধ্যায়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া গেল কেমন করিয়া?

সকলেই জানিয়েছে—সকলেই জানিতে চাহিবে উদ্মি—বিখ্যাত অভিনেত্রী স্মৃতি তাহার স্ত্রী—

এ কি কলঙ্ক—এ কি কলঙ্ক—

জয়ন্ত দুইহাতে মাথা টিপিয়া ধরিল। জানিবেন ভবেশ চৌধুরী, জানিবেন মিলা—অসহ্য—এ ভয়ানক অসহ্য।

জয়ন্তের মনে হয়—পৃথিবীতে তাহার মুখ দেখাইবার এতটুকু স্থান রহিল না।

২৬

পিতাকে লইয়া মিলা আবার গ্রামেই ফিরিল।

মাস কতকের জন্য তাঁহারা দেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন—দেওঘর, মধুপুর ইত্যাদি ঘুরিয়া অবশেষে দেশে ফিরিলেন।

দেশের মাটিতে পদার্পণ করিয়া ভবেশ চৌধুরী বলিলেন—"আঃ, বাঁচলুম।"

মিলা বলিল, "তবু তো আপনি এখানে আসতে চাচ্ছিলে না বাবা।"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভবেশ চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি জানি কেন—আমার মনে বড় দুর্ব্বলতা জেগেছে মিলা,

মনে হচ্ছে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না। ভেবেছিলুম অমূল্যের সঙ্গে তোমার বিয়েটা দিয়ে তোমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি মরব—তাতে আমার এতটুকু দুঃখ হতো না, কিন্তু তুমি যে কিছুতেই রাজি হলে না মা—"

মিলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—বলিল, "আমি রাজি নই বাবা—অমূল্য মিত্রকে বিয়ে করলে আমি সুখী হতে পারব না। আপনার আদেশে হয়তো বাধ্য হয়ে তাকে আমার বিয়ে করতে হবে, কিন্তু সুখী হতে পারব না বাবা। আপনি তাঁকে চিনতে পারেন নি বাবা, আমি তাঁকে চিনেছি। আমার মনে হয়—যে কোন সময়ে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন, স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে তিনি লোককে চাই কি আপনাকেও হত্যা করতে পারেন।"

ভবেশ চৌধুরী এবার না হাসিয়া পারিলেন না, বলিলেন—"এ সব কিন্তু তোমার কল্পনা মিল—"

মিলা জোর করিয়া বলিল, "কিন্তু নিছক কল্পনা নয় বাবা, কল্পনা অন্ততঃপক্ষে খানিকটা সত্যকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে,ফেনানো তারপরে চললেও চলতে পারে। অমূল্য মিত্রের পরিচয় আমি যতটা পেয়েছি তাতে বুঝেছি বাবা—সে আমাকে চায় কেবল এই বিশাল সম্পত্তি, অগাধ অর্থের জন্যই—আর কিছুর জন্যে নয়। যে এতখানি স্বার্থপর—যে চোরের মত আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকতে পারে, আমার জিনিস চুরি করে পালায়—তাকে আমি বিয়ে করতে পারিনে বাবা।"

ভবেশ চৌধুরী পরম স্নেহে কন্যার মাথায় হাতখানা রাখিয়া বলিলেন, "আমাকে একবার তার পরিচয়টা নিতে দাও মিল, তাকে ভালো করে জানতে দাও, তারপরে বিবেচনা করে দেখব।"

উষ্ণ হইয়া মিলা বলিল, "যে লোক নিজে গরীব হয়ে গরীবের দুঃখ বোঝে না, তাদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলতে সাহস পায়—"

ভবেশ চৌধুরী অধৈর্য্যভাবে একখানা হাত তুলিলেন—"এখন যেতে দাও মা, ওসব পরের মুখে শোনা কথা তো, আমাকে নিজের চোখে দেখতে দাও, নিজের কাণে শুনতে দাও, তারপরে একটা কিছু করতে হবে বই কি।"

মিলা তখনকার মত চুপ করিয়া গেল।

মাস চার পাঁচ কলিকাতায় না থাকার জন্য গ্রামের সংবাদ—একমাত্র অমূল্যের রিপোর্টেই যা জানা গিয়াছে। সম্প্রতি অমূল্য দেওঘরে যে পত্রখানা দিয়াছে, তাহা জয়ন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ। সে জানাইয়াছে ভবেশ চৌধূরী যেন পত্রপাঠ একবার এখানে আসেন এবং মন্দিরের পুরোহিতের ব্যবস্থা করিয়া যান।

সে পত্র মিলা পড়িয়াছে—তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে, সে স্পষ্টই জানাইয়াছে এ সব মিথ্যা কথা—জয়ন্তের উপর অমূল্যের বিদ্বেষ মাত্র। পিতাকে সেই সময়ই সে জানাইয়া দিয়াছে—অমূল্য তাহার অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছবি লইয়া গিয়াছে।

গ্রামে আসিয়াই মিলা বিশেষভাবে খোঁজ লইল—ব্যাপারখানা কি ঘটিয়াছে।

স্কুলমিষ্টার স্তুতিদেবী জয়ন্তের স্ত্রী—

মিলা যেন অনেক উপর হইতে ধপ করিয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল, অনর্থকই সে হাঁপাইয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্তে সে শক্ত কাঠ হইয়া গেল। দুই হাতে আর্ত্তভাবে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল মাত্র—কে যেন তাহার বুকে তীরবিদ্ধ করিয়াছে।

অবিশ্বাস করিবারও তো কথা নয়, জয়ন্ত নাকি নিজের মুখেই সকলের সামনে এ কথা সগর্বে স্বীকার করিয়াছে। তাহার স্ত্রীকে সে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহার স্ত্রী এখানে আসিয়া একটা রাত্রি কাটাইয়া গিয়াছে।

অমূল্য ভবেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সে এখানে ছিল না, দু'চারদিন আগে কলিকাতায় গিয়াছিল, ভবেশ চৌধুরী যে সংবাদ মাত্র না দিয়া আসিবেন তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই।

জনশ্রুতি এই দু তিনদিনের মধ্যে অনেক কিছু ভবেশ চৌধুরীর কাণে বহিয়া আনিয়াছিল। দেখা গেল ভবেশ চৌধুরী রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। আগেই তিনি জয়ন্তকে ডাকেন নাই, অমূল্যের কাছে সব শুনিয়া তাহার পর জয়ন্তকে ডাকিবেন তিনি ইহাই মনে করিয়াছিলেন।

অমূল্য আসিবামাত্র তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি অমূল্য, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

অমূল্য শান্তভাবে উত্তর দিল, "বোঝাটা এমন কিছু শক্ত বা জটীল নয় —জয়ন্তের স্ত্রী আছে, আর সে স্ত্রী অভিনেত্রী মাত্র। আমিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এই নারীকেই সে আবার সগর্বে নিজের স্ত্রী নামে পরিচিত দেয়। আমরা কি করে জানব বলুন ? কত লোকে যে তাকে অবিবাহিত বলেই জানেন, তাই না নায়েব যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তারই সঙ্গে নাতনীর বিয়ের কথা ঠিক করতে গিয়েছিলেন—"

কথাটা বলিতে বলিতে সে একবার চকিতে মিলার পানে তাকাইল, মিলু তখন জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। ভিতরের প্রত্যেক কথাটাই যে তাহার কাণে যাইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায় অথচ সে ফিরিল না।

ভবেশ চৌধুরী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সেই পতিতা মেয়েটাকে সে এনেছিল এখানে—আমার ঠাকুরবাড়ীতে, তোমরা জেনে শুনে দেখেও নিশ্চিন্ত ছিলে অমূল্য ?"

অমূল্য দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "নিশ্চিন্ত মোটেই ছিলুম না,—কিন্তু উপায়ই বা কি করব বলুন। মন্দিরের দরজায় চাবি দিলুম, একটানে শিকল শুদ্ধ খসিয়ে ফেললে। দ্বারোয়ানেরা তার বুক ফুলানো দেখে ভয়ে এগিয়ে গেল না।—গায়ে জোর তো বড় কম নেই, একদিন আমার একখানা হাত ধরেছিল, মনে হল হাতখানা যেন অবশ হয়ে গেল—"

মিলা মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিল—তাহার মুখে একটু হাসির রেখা, বড় বড় চোখ দুইটী হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল,—"কি রকম,—আপনাকে মেরেছিল নাকি?" তা যে রকম রোগা মানুষ আপনি।" অমূল্য রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, হাতদুখানা শূন্যে আস্ফালন করিয়া বলিল, "রোগা মোটা নিয়ে কথা হচ্ছে না, সামনাসামনি এলে এক ঘা না মেরে অমূল্য মিত্র মরবে না এটা জেনে রেখো মিলা। পেছন হতে হাত চেপে ধরে কাপুরুষে, আর সে রকমভাবে হাত চেপে ধরলে অতি বড় জোয়ানও কাবু হয়ে যায়। যাক গিয়ে, ও কথা যাক, সে আজ দেড় বছর আগেকার কথা, প্রথম যখন ভশ্চায গ্রামে এল তখনই এ সব কাণ্ড ঘটেছিল।"

শান্তকণ্ঠে মিলা বলিল, "কিন্তু আপনি তো একদিনও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি অমূল্য বাবু?"

উত্তেজিত ভাবে অমূল্য বলিল, "বলে লাভটা কি হতো তখন কি সে কথা তোমরা কাণে তুলতে?"

মিলা বলিল, "তুলতুম কি না দেখতেন। সত্যি তাঁর দোষ হলে আপনি যে তাঁর অমন হাত ধরার ব্যথাটা আর সে অপমানটা তখনি বলতেন না, এ কথা বাবা বা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করব না অমূল্য বাবু।"

অমূল্য ভীষণ রকম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেইজন্যই সে মিলার

কথার কোনও উত্তর না দিয়া ভবেশ চৌধুরীকে লক্ষ্য করিয়া বলি:
"তার স্পর্দ্ধা অসহ্য, আমি তাকে কর্ম্মচ্যুত করে নায়েবকে পুচ্ছে করাবা
জন্যে ভেবেছিলুম—সে স্পষ্ট আমার মুখের 'পরে বললে, তাকে পদচ্যু
করবার অধিকার আমার নেই, একজন চাকর আর একজন চাকরকে পদচ্যু
করতে পারে না, মনিব যখন আসবেন, তখন যা হয় বিবেচনা করা যাবে।"

মিলার মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল,—"ঠিক কথা বলেছেন, এতে তাঁ
পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।"

অমূল্য একেবারে চুপ করিয়া গেল। মিলা যে তাহার সামনেই এম
ভাবে অপমান করিবে তাহা সে স্বপ্নেও কোন দিনই ভাবে নাই।

ভবেশ চৌধুরী কেবল মাত্র বলিলেন—"তুমি চুপ কর মিলা—"

মিলা স্থিরকণ্ঠে বলিল, "সত্যকথা বলবার অধিকার সবারই আ
বাবা,—বীরত্বের প্রশংসা সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে করে থাকে, কাজেই আ
যে কিছু অন্যায় করেছি, তা তো মনে হয় না, ভশ্চায ঠিক কথাই বলে
তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। যে কোন লোক এই কথাই বলবে।"

মিলা অমূল্যের আরক্ত মুখখানার পানে সকৌতুকে তাকাইয়া বাহি
হইয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিলেও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল, মিলা বাহি
হইয়া পড়িল, কাছাকাছি খানিকটা বেড়াইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই সে ফিরিবে
বেচারা অমূল্য তাহার সামনে হয়তো স্বচ্ছন্দে সব কথা বলিতে পারি
না, সেইজন্য মিলা তাহাকে এইটুকু অবসর দিল।

লাল পথটা সোজাভাবে খানিকদূর গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পথে
দুধারে সবুজ দুর্ব্বার গালিচা বিছানো মাঝে মাঝে এক একটা গাঁ
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আপন মনে বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত গিয়া মিলা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার সামনে আসিয়া পড়িল জয়ন্ত—।

মিলা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল—

জয়ন্ত শুষ্ক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেড়াতে বার হয়েছেন বুঝি—?"

মিলা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল,—"হ্যাঁ, আপনি চলেছেন কোথায় ?"

জয়ন্ত বলিল, "যাচ্ছি এদিকে—দরকার আছে। কাল একবার আপনাদের বাড়ী যাব সকালের দিকে—আপনার বাবা আজ আসতে খবর দিয়েছিলেন—কিন্তু জেলে পাড়ায় দরকার আজ বড় বেশী কি না, সে খানিক অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল, "হ্যাঁ একটা কথা বলে যাই। আপনার বাবাকে আজ বলবেন—আর অমূল্য বাবুকেও জানাবেন—গরীবদের ওপর অত্যাচার করলে ভালো হয় না। আপনারা সব বিলেত ফেরত মানুষ, ধর্ম্ম, ভগবান—ইহলোক পরলোক, এ সব তো কিছুই মানেন না, তাই গরীবগুলোকে এমনি করে মারেন, জানেন না তাদের চোখের জলে নামে বন্যা, তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ওঠে সাইক্লোন। নিপীড়ন, অত্যাচার যেখানে দেখা যায়, পতন সেখানে অবশ্য ঘটবেই। ইতিহাস পড়েছেন কোনদিন ? আর একবার না হয় ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবেন—পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন জাতির ধ্বংস হয়েছে এই রকমে—এই অন্যায় নিপীড়নের ফলে। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি এত অবজ্ঞা ভগবান সইতে পারেন না—তাই একদিন ধ্বংস হয়ে গেছে রোম, পম্পিয়াই, আমাদের কুরুবংশ,—অত্যাচারীর শাস্তি তোলা থাকে, একদিন ফলবেই।"

সে দ্রুত চলিয়া গেল, মিলা বিবর্ণ মুখে তাহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সেদিন জয়ন্ত হঠাৎ একখানা পত্র পাইল।

পত্রখানা লিখিয়াছে উর্ম্মি। সে নিরাপদে গিয়া পৌছাইয়াছে। বাড়ীতে ফিরিয়া সে পিতাকে দেখিতে পায় নাই, সম্ভব পিতা গোপালপুরের দিকেই গিয়াছেন। উর্ম্মি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—সে জানে ভবেশ চৌধুরীর সহিত ধনপতি গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিপ্রদ হইবে না। উর্ম্মি জয়ন্তকে অনুরোধ করিয়াছে সে তাহার পিতাকে চেনে, যদি কোথাও তাঁহার দেখা পায় যেন তাহাকে সেই মুহূর্ত্তে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দেয়। ধনপতির মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে সন্দেহ করিতেছে, তিনি হয়তো যা না তাই বলিয়া জয়ন্তকে বাধা দিবেন।

"ভশ্চায মশাই—"

পিছনে কণ্ঠস্বর শুনিয়া জয়ন্ত মুখ ফিরাইল—কোনদিন সে কল্পনা করিতে পারে নাই—মিলা এমনভাবে একা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে। দেখিয়া মনে হয় মিলা যেভাবে ছিল তেমনই চলিয়া আসিয়াছে তাহার মাথার চুল অবিন্যস্ত কাপড়খানা পর্য্যন্ত সে ভালোভাবে পরিতে পারে নাই।

জয়ন্ত ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল,—"আসুন—"

কিন্তু তাহাকে কোথায় সে বসিতে দিবে তাহাই সে ঠিক করিতে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মিলা মন্দিরে উঠিবার সোপানের উপরই বসিয়া পড়িল, বলিল, "আমাকে বসতে দেওয়ার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না ভশ্চাযি

মশাই—এই আমি বেশ বসেছি। আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কয়েকটা কথা আছে।"

জয়ন্ত হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "কিন্তু এখানে এই ধূলোর মধ্যে আপনার বসাটা ঠিক হল না মিস—মিস—"

নামটা সে ঠিক করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মিলা বলিয়া দিল—"আমায় মিলা বলে সম্বোধন করলে খুব খুসী হব। ধূলোর কথা বলছেন কিন্তু এখানে ধূলো মোটেই নেই কাজেই এত উৎকণ্ঠা দেখানোর কোন দরকার দেখছিনে। আপনি বসুন—আপনার সঙ্গে আমার কথাগুলো আগে হোক।"

জয়ন্ত একটু দূরে বসিল, উর্ম্মির পত্রখানা যে মিলার খুব কাছে পড়িয়া রহিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মিলা যে উর্ম্মির কথাই বলিবে সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, ভিতরে ভিতরে সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল।

মিলা সে পত্রখানা দেখে নাই জয়ন্তের যখন হুঁস হইল—হাত বাড়াইয়া সে পত্রখানা তুলিতে তাহার নামটার দিকে মিলার চোখ পড়িল।

মিলা জয়ন্তের পানে তাকাইল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা ভশ্চায মশাই উর্ম্মি নামে যে মেয়েটী এখানে এসেছিল তার সত্যকার পরিচয় আপনি কতটুকু জানেন আমি সেই কথাটাই আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি—আমায় বিশ্বাস করে ঠিক কথা বলবেন আশা করছি।"

জয়ন্ত এক মুহূর্ত্তে শক্ত হইয়া উঠিল, শক্ত ভাবেই উত্তর দিল, "আপনিও নিশ্চয় অমূল্যবাবু এবং আর সকলের কাছে শুনেছেন—আমি সকলকেই জানিয়েছি যে সে আমার স্ত্রী।"

মিলা মাথা দুলাইল, বলিল, "তারা এমনই এক একটা অছিলা খুঁজে

বেড়ায় বলে আপনার কথা শুনবামাত্র মেনে নিয়েছে, বিশ্বাস করেছে,-তাই বলে আমি এ কথা বিশ্বাস করব না ভশ্চায মশাই—উর্ম্মিকে আপ কোনদিন বিয়ে করেছেন। আপনি আর সকলের চোখে ধুলো দিলে আমার চোখে দিতে পারবেন না।"

জয়ন্তের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বা ফেলিল, তাহার বুকের বিরাট বোঝা সরিয়া গেছে।

মিলা বলিয়া চলিল, "আমি আপনার পরিচয় জোগাড় করেছি ভশ্চা মশাই,--আপনি যেখানে থাকেন তাঁদের কাছ হতে আমি সমস্ত সংবা পেয়েছি। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী লাভ করেও কোন কাজ জোগাড় কর না পেরে কেবলমাত্র জীবিকার জন্যেই যে মন্দিরে পুরোহিতের কা করতে এসেছেন সে সব আমি জেনেছি। উর্ম্মির বাড়ীর একটা ঘর ভাড় নিয়ে আপনারা থাকতেন, কয়েকমাসের ভাড়ার জন্যে বই দিয়ে এসেছিলে সবই আমি শুনেছি। আমি সে সব জানতে চাইনে ভশ্চায মশাই, আ শুধু জানতে চাই উর্ম্মি কে—সে কার মেয়ে। তার বর্ত্তমান জীবনে ফিল্মষ্টার, কিন্তু তারও আগেকার কথা—বলুন ভশ্চায মশাই, আপ নিশ্চয়ই জানেন।"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল—এতক্ষণে দৃষ্টি পড়িল—মিলার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে তাহার চোখের পাতা আর্দ্র—বেশ বুঝা যায় তাহার অন্তরে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে।

জয়ন্ত বলিল, "কিন্তু আপনি গোড়াতেই ভুল করছেন মিলাদেবী আমি তাদের বাড়ীর ভাড়াটে থাকলেও তার সঙ্গে আমার এতটুকু পরিচয় ছিল না। আমি যখন এখানে আসি, তারই কয়েকদিন আগে প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।"

মিলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর আর্দ্র চোখ দুটি জয়ন্তের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তবু আমি জানি—আপনি উর্ম্মির সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন—।"

জয়ন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, বলিল, "আমাকে বিশ্বাস করুন মিলাদেবী আমি যতটুকু জানি তা তারই মুখ হতে শোনা,—সে নিজে হতে আমাকে যেটুকু বলেছে কেবল সেইটুকু—"

বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে মিলা বলিল, "হ্যাঁ, আমায় কেবল সেইটুকুই বলুন, হয় তো সেইটুকুতেই আমার যথেষ্ট উপকার হবে—।"

বলিতে বলিতে সে তাহার হাতের ছোট ব্যাগটা খুলিয়া একখানা দুমড়ানো পত্র বাহির করিয়া খুলিল—"আচ্ছা, বলুন ভট্টাচার্য্য মশাই, উর্ম্মির বাবা আছেন তো, তাঁর নাম—"

জয়ন্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "বরাবর আমি তাঁর নাম অনাদি মিত্র বলেই জানতুম, সম্প্রতি জেনেছি তাঁর নাম তা নয়।"

মিলা সোৎসুকে বলিল, "তিনি আফগানীস্থানে কাজ করতেন, আর মেয়েকে অনাথাশ্রমে রেখে মানুষ করেছিলেন? তারপর মেয়েকে নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন—

বলিতে বলিতে দারুণ উদ্বেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

জয়ন্ত শান্তভাবে বলিল, "আপনি অত উতলা হবেন না মিলাদেবী! জানিনে আপনি কিসের জন্য তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানতে চাচ্ছেন, তবু আমি যতটুকু জানি—তা আপনাকে বলছি শুনুন। উর্ম্মির বাবা নাকি তাকে একবছর বয়সে অনাথাশ্রমে দিয়েছিলেন, তারপর বড় হতে সে বোর্ডিংয়ে ছিল, সেখানে তার জন্ম সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার হওয়ায় সে তার বাপের বাড়ীতে আসে। তার বাপ ধনপতি গাঙ্গুলী এতকাল আফগানী-

স্থানেই ছিলেন, সম্প্রতি কিছুদিন হইল তিনি—ওকি মিলাদেবী, আপনি ওরকম করছেন কেন?"

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি মিলার উপর পড়িতে সে দেখিল—মিলার মুখখানা মরার মতই বিবর্ণ হইয়া গেছে, সে চোখ মুদিয়া পিছনের থামে ঠেস দিয়াছে—পিছনের আশ্রয়টী না থাকিলে সে বোধ হয় পড়িয়া যাইত।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—সে নিকটে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিলা চক্ষু মেলিল,—

শুষ্ক একটু হাসির রেখা তাহার মলিন মুখে ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, "আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না ভশ্চায মশাই, আমি মূর্চ্ছিত হই নি—হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। যাক, এবার কাজের কথাই বলি, যা জানতে এসেছি সেইটাই শেষ করে যাই, আপনি এ ছাড়া আর কিছু জানেন না, আর কিছু শোনেন নি?"

জয়ন্ত তাহার কথা কিছুই বুঝিল না, মিলা যেন জটীল একটা রহস্য, তাহাকে বুঝা জয়ন্তের অসাধ্য।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আর কি জানতে চান তা বুঝতে পারছিনে মিলাদেবী?"

মিলা অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল, সামনে একটা নারিকেল গাছের উপর একটা চিল বসিয়া করুণ সুরে চীৎকার করিতেছিল, মাঝে মাঝে পাখা ঝটপট করিতেছিল।—

মিলা চক্ষু নামাইল, বলিল, "ধনপতি গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আরো অনেক কথা আপনি জানেন ভশ্চায মশাই, উর্ম্মির পিতার সব পরিচয় নিশ্চয়ই আপনি জানেন, আমি তাই জানতে চাচ্ছি—।"

জয়ন্ত বলিল, "খুব সামান্য জানি মিলাদেবী, এইটুকু উর্ম্মির কাছে

শুনেছি ধনপতি গাঙ্গুলী এককালে জমিদার ছিলেন,—তিনি খুন করে পালিয়ে যান।"

"হুঁ"

একটা শব্দ মাত্র শুনা গেল, সেটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই শুনাইল।

মিলা উঠিল,

দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি যা কিছু বললেন তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলুম। নমস্কার, আমি যাচ্ছি—"

সে আস্তে আস্তে নামিয়া গেল।

হাতের পত্রখানা যে মাটিতেই পড়িয়া রহিল সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

জয়ন্ত পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে দিবার জন্য যখন দরজা পর্য্যন্ত গেল তখন তাহাকে আর দেখা গেল না,—পথের বাঁকে কোথায় সে মিলাইয়া গেছে।

২৮

ইচ্ছা না থাকিলেও পত্রের নীচের নামটার প্রতি জয়ন্তের চক্ষু আকৃষ্ট হইল—

ধনপতি গাঙ্গুলী, এ পত্র লিখিয়াছেন ভবেশ চৌধুরীকে,—পত্র আসিতেছে সুদূর আফগানীস্থান হইতে, প্রায় মাস তিনেক আগেকার লেখা।

পত্র পড়িয়া জয়ন্ত নিশ্চল হইয়া গেল—এই পত্রে উর্ম্মির এবং তাহার পিতার প্রকৃত পরিচয় সে পাইল।

পত্রে লেখা ছিল—

অনেককাল পরে হঠাৎ আমার এ পত্র পেয়ে তুমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ভবেশ। যে লোককে মৃত বলে জেনেছো,—আজ সে তোমায় পত্র দিচ্ছে,—পরলোক হতে নয় ইহলোক হতেই লিখেছি। উপরের ঠিকানাটা দেখে বুঝেছো আমি এ জগতেই আছি, তোমার ব্যবস্থা না করে আমি মরতে পারব না বলেই বেঁচে আছি।

ভেবেছিলুম, একেবারে গিয়া তোমার সামনে দাঁড়াব—যাকে মৃত বলে আজ একুশ বছর জেনে এসেছো, তাকে সশরীরে সামনে দেখে তোমার মনের ভাব কি হয়, তোমার মুখ দেখে তা জানব। কিন্তু আবার মনে করলুম শত্রুকে জাগিয়ে হত্যা করা উচিত, ঘুমন্ত শত্রুকে আঘাত দিতে নেই, কেবল সেইজন্যে তোমায় জানাচ্ছি আমি বেঁচে আছি, আবার ফিরছি হয়তো দু তিন মাসের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সেই দিনটীর জন্যে তুমি প্রত্যাশা কর ভবেশ চৌধুরী, সেদিন আমি তোমায় ছাড়ব না, তোমায় আমি কুকুরের মত হত্যা করে আমার মনের রাগ মিটাব। আমার এই ইচ্ছাই আছে। কেউ তোমায় সেদিন রক্ষা করতে পারবে না—পুলিস নয়, তোমার শত দেহরক্ষী থাকলেও নয়, তোমার প্রজারাও নয়।

তোমার প্রজা—

কথাটা মনে করলেও হাসি আসে।—

কার ধন কে ভোগ করে? বাইশ বছর আগে যে ছিল জমিদার—সে আজ কোথায়? প্রজারা তাদের বদান্য জমিদার, ধনপতি গাঙ্গুলীকে ভুলে গেছে কি—আজ দেখতে ইচ্ছা হয়—জানতে ইচ্ছা করে।

তুমি জমিদার,—আমার সম্পত্তি তুমি দখল করেছো, আমার বাড়ী

আজ তোমার। আমার একমাত্র মেয়ে উর্ম্মি আজ পথে বিপথে ঘুরছে, আমি নাম গোপন করে আজ একুশ বছর ভিন্ন দেশে পড়ে রয়েছি, আর তুমি—তুমি আমারি সব নিয়ে রাজার মত বিরাজ করছো। তোমার মেয়ে আজ আভিজাত্য সমাজে উচ্চ সম্মান পায়, আমার মেয়ে সমাজের বাইরে পতিত জীবন কাটিয়ে দেয়।

দুর্ভাগিনী মেয়ে আমার, কার পাপের শাস্তি সে ভোগ করছে?—জগৎ তাকে চিনলে পতিতার কন্যা বলে, তার স্থান নির্দ্দেশ করেছে সমাজের বাইরে—যেখানে থেকে শুধু মেয়ে কেন ছেলেরাও আত্মহত্যা করে বসে।

একদিন তুমিই ছিলে আমার পরম বন্ধু, বড় বিশ্বাস করতুম তোমায়, তাই একটী সরলা মেয়েকে তুমি অনায়াসে বিপথে নিয়ে গেলে।

তাকে নিজের হাতে হত্যা করেছি।

আজ মনে করছি—সেই আমি, কেমন করে তাকে হত্যা করলুম। তাকে আমি কতখানি ভালোবাসতুম তা আমি জানি, আর কেউ তার পরিমাণ বুঝবে না। সেই ভালবাসার পাত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে পারি নি, তাই তাকে হত্যা করলুম। তুমি পালিয়ে বাঁচলে,—তখনই তোমায় হত্যা করতুম—পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারতে না, তোমায় পালাতে—বাঁচতে অবকাশ দিলে আমার মেয়ে উর্ম্মি—যাকে আজ তুমি ঘৃণা করবে, তোমার মেয়ের পাশে দাঁড়াবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত দেবে না।

তোমায় আর মাস তিনেক বাঁচবার অধিকার দিলুম ভবেশ চৌধুরী। তুমি আজ পুলিসকে খবর দিতে পারো খুনি ধনপতি চৌধুরী এখনও বর্ত্তমান আছে, তবু আমি জানি—তারা আমায় ধরতে পারবে না, কারণ আমাকে দেখে চেনা আজ তোমার পক্ষেও কষ্টকর হবে।

আমি মরিয়া, বুকে রাবণের চিতা নিয়ে আর গোপন থাকা আমার অসহ্য,—ছদ্মবেশে আমি আর থাকতে চাইনে, এ জীবনে আমার ঘৃণা জন্মে গেছে, তাই আমি এ জীবনকে শেষ করে দিতে চাই। শেষ করার আগে আমি তোমায় চরম শাস্তি দিয়ে যাব—এই আমার প্রতিজ্ঞা—

আজ বিদায়, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। কৃতকর্ম্মের জন্যে তোমায় অনুতাপ করতে দীর্ঘদিন সময় দিলুম—অনুতাপ কর, নিজের অতীতকালের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর—তোমায় সে সময় দিলুম।

তোমার অতীতের বন্ধু
অধুনা পরম শত্রু।

জয়ন্ত বুঝিল—কেন মিলা তাহার নিকটে আসিয়াছিল, কেন সে বিশেষ করিয়া ঊর্ম্মির পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল।

সেও বিস্মিত হইয়াছিল—কারণ সে জানিত না, ধনপতি গাঙ্গুলী এই গ্রামেরই জমিদার ছিলেন। কুড়ি একুশ বৎসর পূর্ব্বে ভবেশ চৌধুরী এই জমিদারী কিনিয়া লইয়াছিল ইহা সে শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহা যে ঊর্ম্মির পৈত্রিক সম্পত্তি তাহা সে জানে না।

সে যদুনাথের নিকটে শুনিয়াছিল জমিদার অপুত্রক অবস্থায় বহুকাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কীয় এক ভাগিনেয় এই জমিদারী ভবেশ চৌধুরীকে বিক্রয় করেন, তিনিও মারা গিয়াছেন।

ঊর্ম্মির পিতার জমিদারী—

রাজকন্যা ভিখারিণীর বেশে নিজেরই রাজত্বে আসিয়াছিল, সে হয়তো নিজেই নিজের পরিচয় জানে না। যে যদুনাথ তাহার বিরুদ্ধে এত কথা প্রচার করিলেন, তিনিও জানেন না এ তাঁহার পূর্ব্ব প্রভুর কন্যা—ঊর্ম্মিও জানে না—এই যদুনাথ একদিন তাহার পিতার অনুগ্রহে

প্রতিপালিত হইয়াছিল—সময় আসিলে কালসর্পের মত তাঁহাকেই দংশন করিতে গিয়াছিল।

এই মন্দির ঊর্মির পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত, জয়ন্তের পূর্ব্বপুরুষগণ ঊর্মির পিতৃপুরুষের কুলপুরোহিত ছিলেন। বর্ত্তমান জমিদার বিশেষ করিয়া সেইজন্যই জয়ন্তের পিতাকে সহ্য করিতে পারেন নাই—তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া তাঁহার ভিটা সমভূমি করিয়া সে জমী বিলি করিয়া দিয়াছেন।

জয়ন্ত অতি সন্তর্পণে পত্রখানা নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিল,—মিলার সহিত যদি কোনদিন দেখা হয় তাহাকে ফিরাইয়া দিবে।

বেচারা মিলা—

জয়ন্ত তাহার জন্য সত্যই বড় কষ্ট পাইতেছিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল পত্রখানা ভবেশ চৌধুরী লুকাইয়া রাখিলেও তাহা মিলার চোখে পড়িয়া গিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে সে নরকে পড়িয়া গেছে, তাহার বেদনা জুড়াইবার স্থান নাই।

পিতার চরিত্রহীনতা বিশ্বাসঘাতকতা সন্তানের কাছে কতখানি বেদনা-জনক তাহা জয়ন্ত অনুভবেই বেশ বুঝিতে পারিল। ভবেশ চৌধুরীর গত জীবনের সমস্ত গ্লানি আজ প্রাণাধিকা কন্যার সামনে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, মিলা এত বড় আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাই ছুটাছুটি করিতেছে।

জয়ন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল—

ধনপতি গাঙ্গুলী যখন ভবেশ চৌধুরীর সামনে দাঁড়াইবেন—তখন মিলা কি করিবে?

—না, সে মিলাকে গোপন করিয়া গিয়াছে—ঊর্মির পত্রখানা তাহাকে দেখানো উচিত ছিল, মিলা বুঝিতে পারিত ধনপতি গাঙ্গুলী আসিয়াছেন,

যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে তিনি ভবেশ চৌধুরীর সামনে দাঁড়াইবেন, সে সতর্ক হইতে পারিত, হয় তো পিতাকে রক্ষা করিতেও পারিত।

জয়ন্ত উর্ম্মিকে একখানা পত্র লিখিয়া দিল—

তুমি একবার এসো উর্ম্মি, এই মুহূর্তে তোমার আবার এখানে আসা দরকার—

জয়ন্ত।

২৯

ভবেশ চৌধুরী দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া ভাবিতেছিলেন।

একটু আগে অমূল্য আসিয়াছিল, শরীর অসুস্থ বলিয়া ভবেশ চৌধুরী তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মিলা একবার পিছন হইতে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল, খানিক বাদে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পিতা তেমনি অবস্থাতেই বসিয়া আছেন সামনে টেবলের উপর চায়ের কাপ যেমন তেমনই পড়িয়া আছে, তিনি চা স্পর্শও করেন নাই।

হায় হতভাগ্য পিতা—

মিলার চোখে জল আসিতেছিল, সে গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া পিছন হইতে পিতার স্কন্ধে একখানা হাত রাখিয়া সে ডাকিল—"বাবা"—

হঠাৎ ভবেশ চৌধুরী এমনভাবে চমকাইয়া গেলেন যাহাতে মিলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পরক্ষণেই ভবেশ চৌধুরী বুঝিলেন মিলা আসিয়াছে। শুষ্কওষ্ঠে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তিনি বলিলেন—"মিল—তুমি এসেছো মা? আমি ভাবলুম আর কেউ বুঝি এলো—"

উদ্গতপ্রায় কান্না চাপিতে চাপিতে মিলা বলিল, "আর কে আসবে বাবা, আর তো কেউ আসবার নেই, আপনার গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আর তো কারও নেই বাবা—"

চোখের জল আর মানা মানিল না, ঝর ঝর করিয়া শ্রাবণের ধারার মতই ঝরিয়া পড়িল—।

তাহার হাত দুখানা হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ভবেশ চৌধুরী ডাকিতে লাগিলেন,—"মিল—আমার মিল—"

কন্যার অশ্রুসিক্ত মুখখানা তিনি কম্পিত বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন- "কাঁদছিস কেন মা—কেন এমন অস্থির হয়ে উঠেছিস মিল ?"

পিতার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া মিলা ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

পিতা নির্ব্বাকে কেবল তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না ।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "তোর বাপ যে মহাপাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে মিল। তোকে কোনদিন কিছু বলিনি—বলতে চেষ্টা করেছি, কে যেন আমার গলা চেপে ধরেছে। আজ আর ইতস্ততঃ করব না মিল,—আমার জীবনের অতীত কথাগুলো শুনে নে, নইলে—"

মিলা মুখ তুলিল, চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি সব জেনেছি বাবা—"

"জেনেছিস—" পিতার কণ্ঠে আর্ত্ত স্বরটা ফুটিল মাত্র—

মিলা বলিল, "হ্যাঁ বাবা, আপনি যা গোপন করতে চেয়েছিলেন—যা গোপন করে এসেছিলেন তা সবই আমি জানতে পেরেছি।"

ভবেশ চৌধুরী নীরবে কতকক্ষণ মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন— তাহার পর মুখ তুলিলেন, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "... অনেক ক তোমার অজানা থেকে গেছে মিল। তুমি জানো না বন্ধুর জমিদারী আ কিনেছি—মূল্য অথচ কাউকে দেইনি, তুমি জানো না, জুটমিলের স সেয়ার ছিল তারই, তা ছাড়াও তার আরও অনেক কিছু পাওনা ছিল- সে সব আমি—"

মিলা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "থাক—থাক বাবা, আমি সে সব ক শুনতে চাইনে।"

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন।

ভবেশ চৌধুরী অন্যমনস্কভাবে জানালাপথে বাহি... পানে তাকাই ছিলেন, চক্ষু ফিরাইয়া মিলার মুখের উপর রাখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলে "আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে মিল, এ প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে। এতকাল আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, জেনেছিলুম ধনপতির যখন কোন সাড়াশব্দ নেই, সে বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে কলকাতায় যখন তা পত্র পেলুম—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি আবা বলিলেন, "আমি জানলুম—সে আসবে। তুমি জানোনা মিল, এই কত দিন আমি কি যন্ত্রণা সইছি। আমি জানি, সে একবার এসে দাঁড়ানো সঙ্গে সঙ্গে আমার সব যাবে—সমাজে আমার মর্য্যাদা,—আমার অর্থ এমন কি আমার মিলাকেও আমি হারাব,—আমি তাই চাইলুম আত্মহ করতে, কিন্তু পারলুম না, একমাত্র মিল, তোমার জন্যেই আমি মরতে পারলুম না মা—"

তিনি দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন—

মিলা কাঁদিতেছিল, চোখ মুছিয়া পিতার পানে চাহিয়া দেখিল তিনি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন।

ব্যগ্রভাবে মিলা ডাকিল—"বাবা—"

কোন উত্তর না পাইয়া সে তাঁহাকে নাড়া দিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বাবা—বাবা"

ভবেশ চৌধুরী চোখ মেলিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, "বেঁচে আছি মিল, জ্ঞানও হারাই নি—ভাবছিলুম অতীত যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মুক্তির কোনও উপায় পাইনে মা তাই ভাবছি— ধনপতির হাতে শিয়াল কুকুরের মত মরার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরা ভালো, মানে মানে সরে যেতে পারব।"

মিলা পিতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মরে আপনি জয়লাভ করবেন—মুক্তি পাবেন—তা নয় বাবা, বরং বেঁচে থেকে যাতে মুক্তি পাওয়া যায় তাই করুন বাবা। আপনি আপনার সব ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে বাঁচাব বাবা—"

"তুই—তুই আমায় মুক্তি দিবি মিল, তুই আমায় বাঁচাবি—?"

পিতা একান্ত আগ্রহে মিলার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন—"কি করে তুই আমায় মুক্তি দিবি মা—তোর হতভাগা বাপকে বাঁচাবি—?"

পিতার হাত দুখানা ছাড়াইয়া লইয়া নিজের মাথায় রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে আপনাকে আমি রক্ষা করব বাবা। আপনি এ সব ছেড়ে দিন, চলুন আমরা এমন একজায়গায় চলে যাই যেখানে কেউ আমাদের পরিচয় পাবে না, চিনবে না। কি দরকার বাবা—এত সম্পদের মধ্যে থেকে,—সামান্যভাবে কতলোক দিন কাটায় আমরাও তাদের মত

ভবেশ চৌধুরী পলকহীন নেত্রে কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"তুমি তো পারবে না মিল,—তোমাকে আমি সে রকম ভাবে তো মানুষ করি নি মা—"

মিলা হাসিল, বলিল, "কিন্তু বাবা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি এই দেশেরই মেয়ে, আমাকে যে ভাবেই মানুষ করুন না কেন—আমি ঠিক এখানকার মেয়ের আদর্শটাই নেব। আমার ঠাকুরমা নিজের হাতে সংসারে কাজ করেছেন,—আমার মাও আদর্শ গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, আমিই কি তাঁদের সীমানার বাইরে চলে যেতে পারব বাবা? যেখানেই যাই—আমায় ঘুরে ফিরে আসতে হবে সেইখানে—যেখানে আমার মা নিজের কর্ত্তব্য পালন করে গেছেন, আমার ঠাকুরমা, দিদিমা কর্ত্তব্য কাজ করে গেছেন যেখানে যত দূরেই যাই, আমাকে এই কেন্দ্রেই ফিরে আসতে হবে যে বাবা বাইরের শিক্ষা সভ্যতা আমাকে যতই বড় করুক, সম্মান দিক ভেতরে আমি যা—তাই আছি, আমার ঘর ছাড়িয়ে আমি কোথাও যেতে পারিনি তো বাবা।"

ভবেশ চৌধুরী স্তব্ধনেত্রে কন্যার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন—

"শেষে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুই করবি মিল, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—"

ভবেশ চৌধুরীর কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, মিলার, হাত দুখানা নিজের বুকের উপর রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমনভাবে তুই করবি—নিজেকে সব হতে বঞ্চিত করে, সব রকমে নির্য্যাতীত করে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে মিলা বলিল, "আপনাকে আগেই বলেছি বাবা

সম্পূর্ণভাবে আমার 'পরে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। এখন আর আপনার কোন ভাবনা করা বা কথা বলা চলবে না, ছোটছেলের মত থাকবেন, যা করাব যা বলাব তাই করবেন—বলবেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বঞ্চিত, নির্য্যাতীত—এ সব কথাগুলো ছেড়ে দিন, আমার মতে চলুন।"

ভবেশ চৌধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, সম্ভব তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল।

মিলা বলিল, "এবার আপনাকে খেতে হবে বাবা—এ চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; আবার চা আনতে বলে দেই, লক্ষ্মীছেলের মত খেয়ে নেবেন, আর একটী কথা বলতে পারবেন না বলে রাখছি।"

সে কলিংবেল টিপিল।—

৩০

বিদায় মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে।

মিলা দ্বারোয়ানকে পাঠাইয়া দিল অমূল্যের নিকটে, বলিয়া পাঠাইল যদি সে পারে যদুনাথকেও যেন সঙ্গে করিয়া আনে। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তকেও সংবাদ দিল,—যদি সম্ভব হয়, সেও যেন একবার আসে।

হঠাৎ এমনভাবে ডাকিয়া পাঠাইবার কারণ অমূল্য বুঝিল না, সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া লইল।

তাহাদেরই প্রতীক্ষায় মিলা বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, ভবেশ চৌধুরী ভিতরে ছিলেন।

আকাশে নিবিড় কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, মুহুর্মুহু চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

সেই ঘন কালো আকাশের পানে তাকাইয়া মিলা ভাবিতেছে তাহার অতীত জীবনের কথা।

কোনদিন সে ভাবে নাই,—স্বপ্নেও জানিতে পারে নাই তাহার ভবিষ্যৎ এতখানি মর্ম্মান্তিক বেদনা বোঝা মাথায় লইয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া দিনগুলাকে সে কাটাইয়া দিয়াছে অভাব অনটন কাহাকে বলে তাহা সে জানে নাই। দুঃখের কথা দারিদ্র্যের কথা সে গল্পেই শুনিয়াছে মাত্র, চোখে দুই একটী দরিদ্র লোকও যে পড়ে নাই তাহা নহে,—তবু তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। এই সব দরিদ্রের দিন যে কিভাবে কাটে, কতখানি দুঃখের সঙ্গে ইহাদের নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া তবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়,—তাহা সে জানে নাই। আজ তাহার সামনে ভবিষ্যৎ সেই দিনের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছে, যাহাদের চিরদিন সে এড়াইয়া আসিয়াছে, আজ তাহারাই তাহার চলার পথে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ যত কষ্টদায়কই হোক—ইহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কোনক্রমে ঠেকাইবার যো নাই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে পড়িতে মিলা সামলাইয়া গেল।

কেন,—কেন সে ফেলিবে দীর্ঘশ্বাস, কেন সে মুছিবে চোখের জল? এতটুকু শক্তি তাহার নাই—এতটুকু সাহসও তাহার নাই—ছি—

হৃদয় যতখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—ততখানি সবল হইয়া উঠিল—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অমূল্যকে গেটের কাছে দেখা গেল; আসন্ন বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় সে দ্রুতপদে আসিতেছে।

বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে মিলাকে দেখিয়া সে হাসি মুখে বলিল, "খুব সময়ে এসে পড়েছি মিল, এখনি বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।"

মিলা গম্ভীর মুখে বলিল, "থামতেও পারে—ঝড় হয়ে এ মেঘ উড়ে যেতেও পারে—"

বলিতে বলিতে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, ঝড় হইয়া এ মেঘ হয় তো উড়িয়া যাইবে, নীল আকাশে আবার চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র উঠিবে, পৃথিবী আবার আলোয় পূর্ণ হইয়া যাইবে, ফুল ফুটিবে, পাখী গাহিবে,—তাহার মনে এবং চারিদিকে যে মেঘ জমিয়াছে এ মেঘ ইহজীবনে কাটিবে না।

নিজের কর্ত্তব্য সে ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে বি, এ, ডিগ্রি পাইয়াছে,—যে কোন স্থলে একটা কাজ যোগাড় করা তাহার কাছে কঠিন হইবে না। পিতার শেষ জীবনটা যাহাতে শান্তিপূর্ণ হয় তাহা সে করিবে। আজই কয়েকটা স্থানে সে দরখাস্ত পাঠাইয়াছে, পিতা এখন জানিতে না পারিলেও পরে জানিতে পারিবেন।

অমূল্য একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, মিলার মুখের পানে এইবার সে ভালো করিয়া চাহিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে মিল, অসুখ বিশুখ কিছু করেছে নাকি? এ রকমভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠানোর কারণ আমি কিছু বুঝছিনে, তাই—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া মিলা বলিল, "আমি খুব ভালো আছি মিঃ মিত্র, আজকের এই দুঃখময় দিনে আপনি যে যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীর মত আমার জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন—সে জন্যে সত্যই আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া অমূল্য বলিল, "তার মানে?

মিলা শান্তকণ্ঠে বলিল, "মানে—সুসময়ে অনেক বন্ধু মেলে, অসময়ে

কাউকে পাওয়া যায় না কি না। একটা কথা আমাদের দেশের কবি লিখে গেছেন—জানেন—

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়—
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

অমূল্য চিন্তিত মুখে বলিল, "এ সব কথা বলার মানে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে মিল, কি যে হেঁয়ালির ভাবে কথা বলছো—যা বোঝা আমার মত লোকের পক্ষে বড় শক্ত বলেই মনে হয়।"

মিলা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "অথচ এ সব কথা আগে আপনারই জানার কথা ছিল মিঃ মিত্র। যাই হোক, জানেন না যখন বলছেন, তখন আমাকেই সব কথা জানাতে হবে বই কি। হয় তো আপনি জানেন না তাই বলছি—আমি আর বাবা চিরকালের মত এখান হতে চলে যাচ্ছি—এই জমিদারী আর বাড়ীর প্রকৃত যে মালিক, তাঁকে তাঁর সব ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

অমূল্য প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"সে কি কথা—"

পর মুহূর্ত্তে সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিল—মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ সব মিছে কথা তুমি তামাসা করছো—।"

মিলা একটু হাসিল, সে হাসি যেন কান্নারই রূপান্তর মাত্র; সে বলিল, "আমার কথা মিথ্যে নয় মিঃ মিত্র, আমি সত্য কথাই বলছি। সামনের সপ্তাহেই আমি বাবাকে নিয়ে চলে যাব, কোথায় যাব তার ঠিক নেই। আপনাকে আগেই কথাটা জানাবার দরকার আছে বলে মনে করছি—কারণ আপনি অনেককাল হতে আশা করে আছেন, আমার সঙ্গে এত বড় জমিদারী, জুটমিলের সম্মানীয় পদ আর তার সঙ্গে প্রচুর অর্থ, সবই আপনি লাভ করবেন। আমি সত্য কথাই আপনাকে জানাচ্ছি,

এখন শুধু আমাকেই পাবেন, এ ছাড়া একটী পয়সা নয়—এমন কি একখানা গহনা পর্য্যন্ত আমার বাবা আপনাকে দিতে পারবেন না। ফাঁকি দিয়ে এত বড় কাজটা করা আমার বা বাবার কারও ইচ্ছা নয়। সেই জন্যেই কথাটা আগে হতে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, সব শুনে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাই করুন।”

অমূল্যের মুখখানা কালো হইয়া উঠিল—সে কি ভাবিতেছিল।—

মিলা বলিল, “আপনাকে সব কথা জানিয়ে দেওয়া আমরা ভালো বলে মনে করি মিঃ মিত্র। আপনি পুরাণো দলীলপত্র নিশ্চয়ই দেখেছেন এ জমিদারী ধনপতি গাঙ্গুলীর ছিল, মাত্র কুড়ি একুশ বছর বাবা নিয়েছেন—”

অমূল্য উত্তর দিল, “দেখেছি।”

মিলা বলিল, “কোন কারণে ধনপতি গাঙ্গুলী এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন এবং হয় তো আট দশদিনের মধ্যেই তিনি এখানে এসে পড়বেন। তাঁর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হচ্ছিল, আমার বাবা সেই সময় এটা কিনেছিলেন। আমরা জানতুম ধনপতি গাঙ্গুলীর সন্তানাদি ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি জেনেছি তাঁর একটী মেয়ে আজও বর্ত্তমান আছে। আপনি একটা কথা জানেন না মিঃ মিত্র,—যে উর্ম্মিকে নিয়ে আপনারা ভশ্চায মশাইকে অতখানি নির্য্যাতন করেছিলেন, ধনপতি গাঙ্গুলী সেই উর্ম্মিরই পিতা,—এই জমিদারী, বাড়ী, ঠাকুরবাড়ী-সব কিছুরই প্রকৃত মালিক সেই নির্য্যাতীতা উর্ম্মি—।”

অমূল্য প্রকাণ্ড বড় হাঁ করিয়া ফেলিল, তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

মিলা বলিয়া চলিল, “সেই একদিন আপনারা যে উর্ম্মিকে অপমান করে গ্রাম হতে তাড়িয়েছিলেন, সেদিন নিশ্চয়ই উর্ম্মি নিজের পরিচয় জানতো

না, তার বাবা তাকে কোনদিন এ সব কথা জানান নি। দুর্ভাগ্য দেখুন মিঃ মিত্র, রাজার মেয়ে এসে তারই রাজ্যে দাঁড়ালো ভিখারিণীর বেশে, তার প্রজা তাকে করলে নির্য্যাতন, তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে। ব্যাপারটা ঠিক যেন গল্পের মত হয়, বায়স্কোপের ছবির মত ঘটনাগুলো চোখের 'পরে ভাসে। সত্যই আশ্চর্য্য মনে হয় না—বলুন তো?"

অমূল্য শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু পরিচয় না পেলে—"

বাধা দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মিলা বলিল, "হ্যাঁ, চাকরী বাঁচাবার সম্মানে বর্ত্তমান থাকবার এই একটা উপায় আছে বটে।"

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল।

বাহিরে তখন বৃষ্টিসহ ঝড়ের উন্মাদ নর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গেছে। আকাশের বুকে জমাট বাঁধা কালো মেঘ বাতাসের আঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহারই বুকে মাঝে মাঝে চোখ ঝলসাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

অদূরে নারিকেল গাছের মাথার উপরে বজ্রপাত হইল—চোখ ঝলসাইয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল।

অমূল্য দুইহাতে কাণ চাপা দিল, মিলা এতটুকু নড়িল না, চাহিয়া দেখিতে লাগিল গাছের পাতাগুলি সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কেমন জ্বলিতে লাগিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিলা চোখ ফিরাইল।

শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি উর্ম্মিকে জানিয়ে যাব বাবার আমলে যারা কাজ করছে, তাদেরই যেন রাখা হয়, কারও অন্ন যেন [illegible] যায়। আপনারা যেমন আছেন তেমনই থাকবেন—মিঃ মিত্র, কিছু ভাববেন না।"

সে উঠিল—"একটু বসুন, আমি আসছি—"

সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

অমূল্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কোনদিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল।

খানিক পরে মিলা যখন ফিরিয়া আসিল তখন আকাশের ঘন মেঘ পাতলা হইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সূর্য্য মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া উঠিতেছিল, মেঘ ও সূর্য্যের এই খেলা সত্যই অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

অমূল্য হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—"আমি যাই, কাজ রয়েছে।"

মিলা বলিল, "বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

অমূল্য বলিল, "পরে আসব এখন, কাজটা শেষ না করে আমি—"

মিলা একটু হাসিল, বলিল,—"না না, কাজটা আগে সেরে ফেলুন গিয়ে।"

অমূল্য আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল—।

সঙ্গে সঙ্গে মিলাও বাহির হইয়া বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল—।

মুক্তিতে পাওয়া যায় প্রচুর আনন্দ। এই সব কথা শুনিবার পরে অমূল্য যে আর তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না তাহা মিলা জানে। অমূল্যকে সে বেশ চেনে,—তাহার উন্নতির লালসা এ সময় তাহাকে পিছনে টানিয়া লইবে। তাহার জন্যই যে অমূল্য তাহাকে বিবাহ করিতে চায় তাহা নয়, সে চায় বিশাল সম্পত্তি সহ মিলাকে, কেবলমাত্র মিলাকে নয়। অর্থ ও নাম ব্যতীত সুন্দরী শিক্ষিতা মিলার মূল্য তাহার নিকটে এক কানাকড়িও নয়।

ঊর্ম্মি—

ঊর্ম্মি হোক রাজরাণী, ঊর্ম্মি করুক রাজত্ব, এ সবে তাহারই যথার্থ অধিকার, মিলাকে ?

পুরোহিত জয়ন্ত পুরুষানুক্রমে মন্দিরের পূজারী হইয়া থাক, অথবা ঊর্ম্মিকে বিবাহ করিয়া জমিদার হোক, মিলা তাহাদের মঙ্গল কামনাই করে।

ভীষণ অবসাদে মিলার দুইটী চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চেয়ারের পিছনে মাথা রাখিয়া সে বড় ক্লান্তকণ্ঠে ডাকিল—"মা—"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুদিত নেত্রকোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

অভিনয় অভিনয়,—আর সে অভিনয় করতে পারে না, নিজেকে আর গোপনতার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। এই আবরণের আড়াল হইতে প্রকাশ হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু কোনও উপায় নাই, কোন পথ নাই।

৩১

জয়ন্তের পত্রের অর্থ ঊর্ম্মি বুঝিতে পারে না।

সেদিন যেস্থল হইতে অপমানিত হইয়া জয়ন্তের মাথায় অপবাদের বোঝা চাপাইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে আজ সেখানে ফিরিয়া যাইবার আহ্বান আবার কেন ?

ঊর্ম্মি পত্রখানা ড্রয়ারে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাই ভাবিতেছিল।

কয়েকদিন হইল কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধনপতি হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তিনি কলিকাতায় থাকিতে চাহিতে ছিলেন না, শীঘ্রই কোথাও চলিয়া যাইবেন এ কথাও তিনি মিলাকে জানাইয়াছিলেন।

হঠাৎ তাঁহার অন্তর্দ্ধান ব্যাপারটা উর্ম্মিকে বড় বিচলিত করিয়াছিল। প্রতিহিংসা লইবার জন্ম ধনপতি উন্মাদের মত হইয়াছেন, ইহারই মধ্যে দুইদিন বালিগঞ্জে গিয়া ভবেশ চৌধুরীর সন্ধান করিয়াছেন তাহা সে জানে।

কতদিন রাত্রে রুদ্ধদ্বার ঘরে ধনপতির পাদচারণা করার শব্দ শুনিয়াছে, ভিতরে গর্জ্জন শুনিয়াছে—বিড় বিড় করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "পালাবে কোথায় ভবেশ চৌধুরী, আমার হাত হতে মুক্তি তোমার নেই। তোমায় কুকুরের মত হত্যা করব, তুমি ছটফট করবে—আমি দেখব। তোমার রক্তে আমার পিপাসা মিটবে; তার আগে নয়।"

সমস্ত রাত্রি চলিত তাণ্ডব-নৃত্য, সকালে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না এই লোকটী সারারাত একা একা কথা বলিয়াছে, ভীষণ কাণ্ড করিয়াছে।

উর্ম্মি সর্ব্বদা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত, সেদিন সে ছিল না বলিয়াই অতি সহজে ধনপতি গৃহত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তিনি যে ভবেশ চৌধুরীর সন্ধানেই যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে উর্ম্মির এতটুকু সন্দেহ ছিল না, উৎকণ্ঠিত ভাবে সে তাই আগেই জয়ন্তকে পত্র দিয়াছিল।

জয়ন্তের পত্রে উর্ম্মি কিছুই বুঝিল না। মোক্ষদাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি গোপালপুরে যাচ্ছি মাসীমা, বাবা বোধ হয় সেখানেই গিয়েছেন। যদি সেখানে গিয়ে বাবাকে পাই, সঙ্গে করে নিয়ে আসব, যদি দুদিন দেরী হয়—ভেবো না।"

সে রওনা হইল।

ভবেশ চৌধুরীর সামনে ধনপতি—

কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠে। সে জানে ভবেশ চৌধুরী তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—পিতা সেই প্রতিশোধ লইবার জ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উর্ম্মি যখন গ্রাম্য ষ্টেশানে আসিয়া পৌছাই তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব ছিল না।

উর্ম্মি একাই পথ চলিতে লাগিল।

এ দিককার পথে লোক চলে কম, দুদিকে যে মাঠ দেখা যা তাহার ওপারে গ্রামের সীমানা, এ সবই উর্ম্মির পূর্ব্ব পরি

সেদিন উর্ম্মি জানিত না—এ সবই একদিন তাহার পিতা সম্পত্তি ছিল, যে ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করার অপরাধে সে অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়াছে, সে ঠাকুরবাড়ী তাহারই পৈত্রিক সম্পত্তি, ভবেশ চৌধুরী কিছুই নয়।

কি দারুণ দুঃখময় তাহার জীবন, নিজের পরিচয় সে মোক্ষদা নিকটে পাইয়াছে, মোক্ষদা আর কোন কথা গোপন করে নাই।

মোক্ষদা ধনপতি গাঙ্গুলীর শ্যালিকা, উর্ম্মির মাসিমা। ধনপতি উর্ম্মিকে তাহার সমস্ত পরিচয় গোপন করিয়া গিয়াছিলেন, মোক্ষদা কোন কথা বলেন নাই।

আজ এই গ্রামের পথে চলিতে চলিতে উর্ম্মি ভাবিতেছিল—একদি এই-গ্রামের বুকে ছিল ধনপতি গাঙ্গুলীর অপ্রতিহত প্রভাব, আজ সেখানে তাঁহার স্থান নাই, তাঁহার কন্যা উর্ম্মি সেখানে হয় নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত পিতাকে সে সব সম্বন্ধে কোন কথা সে জানায় নাই।

একদিন এই গ্রামের কত লোক ধনপতি গাঙ্গুলীর অন্নে প্রতিপালি

হইয়াছে, কত লোক আশ্রয় পাইয়াছে, আজ কি তাহারা সে সব কথা ভুলিয়া গেছে ?

যদুনাথের পরিচয় সে মোক্ষদার নিকটে পাইয়াছে।

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ধনপতির পরম বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, সেই জন্যই যদুনাথ তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিয়াছেন। বিশ্বাস করিয়া ধনপতি যে সব কথা যদুনাথকে বলিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতক যদুনাথ সে সব, কথা উপযুক্ত মূল্যে ভবেশ চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছেন।

উর্ম্মি দাঁতের উপর দাঁত রাখিল।

এই সব বিশ্বাসঘাতকদের যদি পৃথিবীর বক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলা যায়, পৃথিবীর বুকের অনেক পাপের বোঝা কমে।

চলিতে চলিতে উর্ম্মি হঠাৎ সামনে বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, সামনে দাঁড়াইয়া একটী মেয়ে যাহাকে দেখিবার আশা সে মোটেই করে নাই।

সন্ধ্যার ম্লানায়মান আলোকে মনে হইল সে যেন চলন্ত একখানা বিদ্যুৎ—হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। গ্রামে কল্যাণীদেবী যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেন উর্ম্মির চোখের সাম্‌নে।

উর্ম্মি নিষ্পলকে দেবীর পানে তাকাইয়া রহিল।

মিলাও তাহাকে দেখিয়া কম বিস্মিত হয় নাই। এই সুন্দরী মেয়েটীকে সে কোনদিন এ গ্রামে দেখে নাই, তাই পরম বিস্ময়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত করিয়া খানিক চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে—?"

মন্ত্রমুগ্ধার মতই উর্ম্মি উত্তর দিল, "আমি উর্ম্মি—"

"তুমি উর্ম্মি ?"

মিলা খানিকক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া রহিল—তাহার কণ্ঠে একটী মাত্র শব্দ ফুটিল—"ও"

আস্তে আস্তে সে ফিরিল।

উর্ম্মির মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, মুহূর্ত্ত সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মিলার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপনি কে তা তো জানতে পারলুম না।"

মিলা থামিল, তাহার মুখের উপর স্নিগ্ধ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল—উর্ম্মির মনে হইল উহা হাসি নয়, বুকভরা বেদনা, একটু মরা হাসির আকারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মিলা বলিল, "আমি—আমার পরিচয় চাও? আমার পরিচয়—আমি এক দুর্ভাগিনী সন্তান, পিতার কৃত কাজের প্রায়শ্চিত্ত করছি; শুধু এইটুকু জেনে রাখো বোন—আর কিছু নয়।"

উর্ম্মি আর অগ্রসর হইতে পারিল না—মিলা চলিতে চলিতে অন্ধকারের বুকে কোথায় মিলাইয়া গেল।

মন্দিরের কাছে পৌঁছাইয়া উর্ম্মি দেখিল, কে সদর দরজার পার্শ্বে বাঁধানো জায়গাটায় একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গেটের উপরে যে আলোটা জ্বলিতেছিল তাঁহাতে তাহাকে স্পষ্টভাবে না দেখিতে পাওয়া গেলেও উর্ম্মি চিনিল সে জয়ন্ত ছাড়া আর কেহ নহে।

"ঠাকুর মশাই—"

জয়ন্ত যেন চমকাইয়া উঠিল "কে উর্ম্মি?"

উর্ম্মি সামনের বাঁধানো জায়গায় শ্রান্তভাবে বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ আমি। আপনার পত্র পেয়েই চলে এসেছি ঠাকুর মশাই, একটুও দেরী করিনি। আপনার আরতি হয়ে গেছে?"

জয়ন্ত মলিন হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সন্ধ্যে জেলেই যেমন তেমন করে সেরে নিয়েছি আরতিটা। ধূমধাম করবার আর দরকার হয় না উর্ম্মি, বিরাট আয়োজন করতে আর ইচ্ছা হয় না।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, "খেয়ে এসেছো ?"

উর্ম্মি বলিল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্ত চুপ করিয়া রহিল।

উর্ম্মি জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কিসের জন্যে পত্রপাঠ মাত্র চলে আসতে বলেছিলেন ঠাকুর মশাই ?"

জয়ন্ত একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভবেশ চৌধুরীর মেয়ে মিলা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁরা বোধ হয় কাল বিকেলে চিরকালের মতই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন—"

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বরটা যে আর্দ্র হইয়া উঠিল তাহা উর্ম্মি বুঝিল।

গেটের মাথার উপর মাধবীলতার মাঝে মাঝে ফুলগুলা বাতাসে দোলা খাইতেছিল, উঠানের পাশে পাশে গন্ধরাজ আছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল। দূরে কোথায় কোকিল ডাকিতেছিল তাহার সুমিষ্ট সুর এখানেও ভাসিয়া আসিতেছিল।

জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "এখানেই থাকবে তো উর্ম্মি?"

উর্ম্মি বলিল, "আর কোথায় থাকব ঠাকুর মশাই—আমি এখানে কাউকেই তো চিনিনে—"

জয়ন্ত বলিল, "ভেতরে এসো।"

ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে উর্ম্মি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কিছু পেয়েছেন ?"

জয়ন্ত বলিল, "না, তবে আশা করছি হঠাৎ কোনদিন তিনি এসে পড়বেন—"

"হুঁ" উর্ম্মি চুপ করিয়া গেল।

৩২

হাতের কাগজপত্রগুলা গুছাইয়া রাখিয়া মিলা শ্রান্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া একটা হাই তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানা উর্দ্ধে তুলিল।

সামনের বারাণ্ডায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল, জুতার মসমসানী শব্দটা দরজার কাছে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

মিলা জিজ্ঞাসা করিল "কে ওখানে—"

উত্তর আসিল—"আমি—"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মিলা এই বৃদ্ধের পানে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—বলিল—

"বসুন।"

বৃদ্ধ অকুণ্ঠিত পদে ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবলের ধারে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "আমি জমিদার ভবেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, বিশেষ দরকার।"

"জমিদার ভবেশ চৌধুরীর সঙ্গে—"

মিলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার পানে চাহিল, শান্তকণ্ঠে ব[illegible] করেছেন, এখানে ভবেশ চৌধুরী আছেন বটে, কিন্তু তিনি জমিদার নন, তিনি ভিখারী ভবেশ চৌধুরী।"

বৃদ্ধ বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। মিলা বলিল, "আপনার বোধ হয় গ্রামের কারও সঙ্গে পরিচয় নেই, থাকলে জানতে পারতেন—ভবেশ চৌধুরী এখন কপর্দ্দকশূন্য, 'এখানকার একজন দরিদ্র লোকের যা আছে তাঁর তাও নাই। আমার মনে হয় আপনি এখানকার লোক নন, অনেক দূর হতে আসছেন বলে কোন খবরই পান নি।"

বুদ্ধিমতী মিলার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল ইনিই ধনপতি গাঙ্গুলী।

বৃদ্ধ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কথাটা ঠিক, আমি এখানকার লোক নই সেইজন্যেই কোন খবর জানিনে।"

মিলা বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই প্রার্থীরূপে আমার বাবার কাছে আসেন নি তা বুঝতে পারছি। কি চান সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার যা দরকার তা তাঁর কাছেই হবে, তাঁর মেয়ের কাছে সে সব কথা বলতে আমি রাজি নই—। তোমার বাবাকে খবর দাও, তিনি এলে তাঁর সঙ্গে কথা হবে।"

পিছনের দিককার দরজার পর্দ্দা ঠিক এই সময় সরাইয়া ভবেশ চৌধুরী প্রবেশ করিতে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন—মিলা দেখিল তাঁহার মুখখানা নিমেষে শবের মত মলিন বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হাতে দুই দিককার কপাট চাপিয়া ধরিলেন, নচেৎ বোধ হয় তিনি পড়িয়া যাইতেন—

বৃদ্ধের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি হাতখানা প্রসারিত করিয়া [illegible] "এসো বন্ধু, তোমার বাড়ীতে আজ আমি অতিথি' আশা করছি আতিথ্য সৎকার হতে বঞ্চিত হয়ে পাপার্জ্জন করবে না। বাইশ বছরের অদর্শনে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুকে তুমি ভুলে যাওনি।"

মিলার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "বুঝেছো মা লক্ষ্মী, এক আধদিন নয়, দীর্ঘ বাইশ বছর পরে আমাদের দেখা হল, বড় কম দিনের কথা নয়।"

পিতাকে কাঁপিতে দেখিয়া মিলা তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, ধৃত হাতে বারবার ঝাঁকানী দিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "বাবা—বাবা—"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "অনেকদিন পরে পুরাণো বন্ধুকে দেখে সকলেরই মনে আলোড়ন হয় বই কি, পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগে। আমি কিন্তু তোমার মত বিহ্বল হই নি চৌধুরী, চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে, আমার দেহের দিকে, আমার দেহে এখনও এতখানি শক্তি আছে যাতে তোমার মত লোককে পিষে মারতেও পারি—"

ভবেশ চৌধুরী কম্পিত কণ্ঠকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিলেন, "আমি তা জানি ধনপতি; তুমি একদিন আসবে আর আমায় তোমার সবল আলিঙ্গনে পিষে মারবে।"

ধনপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—খানিকক্ষণ হাসিয়া হাসি থামাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন রইলে বন্ধু বসো, অনেকদিন পরে দেখা কথাবার্ত্তা হোক। বর্ত্তমানের আলোচনা অতীতের আলোচনা—"

মিলা ভবেশ চৌধুরীকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "আপনি এ চেয়ারটায় বসে কথাবার্ত্তা বলুন বাবা,—দুর্ব্বল শরীরে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না।"

ভবেশ চৌধুরী কন্যার পানে তাকাইয়া অত্যন্ত মলিন একটু হা[illegible]

ধনপতি বলিলেন, "দুর্ব্বল শরীর—মানে—অসু[illegible]—। হাঁ, ভ চৌধুরীর চেহারা দেখলে বোঝা যায় বটে যে সে সুস্থ নেই। যাই হোক,

বিচারকের সামনে অপরাধীর মত আমি তোমাকে দাঁড়াতে বলিনে চৌধুরী, তুমি স্বচ্ছন্দে বসতে পারো, ইচ্ছামত কথাবার্ত্তাও বলতে পারো, তোমার অসংযত কথাবার্ত্তার জন্যে আমি তোমায় বিশেষ দোষী করব না।”

ভবেশ চৌধুরী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন, একটী কথাও তাঁর মুখ হইতে বাহির হইল না।

লোকটার অসহ্য স্পর্দ্ধা, কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া মিলার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে উচ্চস্বরে কি বলিতে যাইতেছিল, ধনপতি বাধা দিলেন, বলিলেন, “আমার মনে হয়, তোমার এখানে না থাকাই ভালো মা লক্ষ্মী। কি বল চৌধুরী, আমাদের এ সব কথাবার্ত্তার মাঝখানে মেয়েদের রেখে লাভ কি, এতে কিছু তোমার পৌরুষও বাড়বে না, আমার পৌরুষও বাড়বে না।”

মিলা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, “বাবা অসুস্থ, আমি ওকে একা রেখে যেতে ইচ্ছে করিনে।”

ধনপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ভবেশ চৌধুরী মুখ হইতে হাত নামাইলেন, আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, “ধনপতি তোমারও মেয়ে আছে।”

ধনপতি উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ আছে, কিন্তু তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে চৌধুরী। আমার মেয়ে ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা—পতিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে সে;—কোনদিন সমাজের মধ্যে সে স্থান পাবে না, কেহ তাকে বিবাহ করে গৃহলক্ষ্মীর পবিত্র আসন দান করবে না। সে চিরদিন আমাকে দেবে অভিশাপ, তার মাকে [illegible] অভিশাপ, আর—আর—”

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ভবেশ চৌধুরী

নিরুপায় ভাবে হাত কচলাইতে ছিলেন, মিলা তাহার পিছনে চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—মুখখানা তাহার শবের মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার দিকে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে ধনপতি বলিলেন, "আমি বলছি তুমি এখান হতে যাও, মেয়ের সামনে সে সব কলঙ্ককর আলোচনা আমি করতে চাইনে—আমারও মেয়ে আছে।"

মিলা কম্পিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনার মতন লোকের হাতের কাছে আমার বাবাকে ফেলে আমি যেতে পারব না; আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে।"

ধনপতি ভবেশ চৌধুরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনছো চৌধুরী তোমার মেয়ে নাকি আমায় বিশ্বাস করতে পারে না, আমাকে সে অবিশ্বাস করে। তাই বটে—ধনপতি গাঙ্গুলীকে আজ কেউই বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু বাইশ বছর আগে, সেদিনকার কথা মনে পড়ে চৌধুরী?"

ক্ষীণকণ্ঠে ভবেশ চৌধুরী ডাকিলেন, "মিল—"

"বাবা—"

মিলা সরিয়া পার্শ্বে আসিল।

পিতার মড়ার মত বিবর্ণ মুখ দেখিয়া সে চোখের জল সামলাইতে পারিল না, হঠাৎ দুই ফোঁটা জল উপছাইয়া ভবেশ চৌধুরীর হাতের উপর পড়িল। চমকাইয়া উঠিয়া ভবেশ চৌধুরী মিলার মুখের দিকে চাহিলেন।

কন্যাকে বাহুপাশে টানিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "[illegible] ও ঘরে যাও মিল, আমি কোনদিন তোমায় আদেশ [illegible], আজ [illegible] আদেশ করছি সে আদেশ রাখো।"

মিলা পিতার দিকে মুখ ফিরাইল—সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনার আদেশ আমি নিশ্চয়ই পালন করব বাবা, আমি যাব কিন্তু—"

বলিতে বলিতে নিতান্ত হঠাৎ সে ধনপতির পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, হাত দুখানা জোর করিয়া সজল নেত্র তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনারও মেয়ে আছে, মনে করুন, আমি আপনার সেই মেয়ে, আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। ভবেশ চৌধুরী যখন আপনার বন্ধু ছিলেন তখন যাই করুন আজ তিনি আমার বাবারূপে শাস্তি পেতে পারেন না। আমি আপনার কাছে আমার বাবার জীবন-ভিক্ষা করছি, আমাকে কথা দিন, আপনি বাবার জীবনের উপর হস্তার্পণ করবেন না, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই—"

ধনপতি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মেয়েটীর অসাধারণ চাতুর্য্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মিলা তাঁহার পা দুখানার উপর মাথা রাখিল—ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "আপনি মানুষ, আপনার মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন দয়া মায়াও আছে, আপনি পাথরে তৈরীর ভাণ দেখালেও পাথরে তৈরী নন। আমার বাবা ভুল করেছিলেন, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করছেন আমিও করছি,—তিনি শাস্তি বহন করছেন, এরপরে আর কোন—"

ধনপতি পা টানিয়া লইলেন, কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "থাক, শিক্ষার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছো, আর অনর্থক বাক্য ব্যয় করতে হবে না। তোমার বাবার সঙ্গে আমায় কথা বলতে দাও, যদি ওকে শাস্তি দিতেই হয় তোমার সামনে দেব কথা দিচ্ছি। যাও এখন, আমাকে আর দেরী করিয়ো না অনর্থক—"

আহতভাবে মিলা উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিতে গেল, "কিন্তু ওকে—"

অধৈর্য্যভাবে ধনপতি বলিলেন, "তুমি বড় অবাধ্য মেয়ে, আমি যা বললুম তা কর—"

মিলা আর একটি মাত্র কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

৩৩

নিস্তব্ধ ঘর—

সেই ঘরে কেবলমাত্র দুইজন, শীকার ও শীকারি। দুর্দ্দান্ত বাঘ শীকার ধরিবার পূর্ব্বে যেভাবে থাবা পাতিয়া খানিক বসিয়া থাকে, ধনপতিও ঠিক সেইভাবে ভবেশ চৌধুরীর সামনে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখের উপর তীব্র দুইটা চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া।

ভবেশ চৌধুরী চোখ তুলিতে পারিতেছিলেন না, অথচ স্পষ্ট তিনি অনুভব করিতেছিলেন সেই তীব্র দৃষ্টি সূঁচের মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইতেছে। দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, তথাপি ভবেশ চৌধুরী এতটুকু নড়িতে পারিলেন না।

"চৌধুরী—"

ধনপতির আহ্বানে ভবেশ চৌধুরী চমকাইয়া চোখ তুলিলেন।—

ক্রুর হাসি হাসিয়া ধনপতি বলিলেন, "কবে হতে মেয়ের আঁচলের তলায় থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখেছো শুনি—?

অকস্মাৎ ভবেশ চৌধুরী দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন—"তোমায় বলছি ধনপতি, তোমার যা খুসি তুমি আমায় বলতে পারো, আমায় তুমি হত্যা কর,—আমার মেয়ের সম্বন্ধে একটি কথা তোমার মুখে আমি শুনতে চাই নে।

আমি আশা করছি—এরপর তোমায় আমার মেয়ের দিকে লক্ষ্য করে কোন কথা বলতে শুনব না, তা হলে—"

কথা শেষ না করিয়া অত্যন্ত অবসন্নভাবে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ধনপতি আবার হাসিলেন, "বাঃ, বেস বলেছো চৌধুরী, তোমার যে খুব বুদ্ধি আছে এ কথা আমি আগেও বলেছি, আজও আবার বলছি। যাক, তোমার মেয়ে সব জানে দেখছি, তুমি নিজেই সব কথা বলতে পেরেছো?"

ভবেশ চৌধুরী একটি উত্তরও দিলেন না।

ধনপতি নিস্তব্ধভাবে জানালাপথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কোনমতে রোধ করিতে পারিলেন না।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হঠাৎ এক সময় তিনি ভবেশ চৌধুরীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসেছিলুম চৌধুরী, পারলুম না, কি জানি—মনটা কি রকম হয়ে গেল। এই নাও, তোমার সামনে রিভলভার রাখলুম, আর আমায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।"

পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া তিনি টেবলের উপরে রাখিলেন—

"আমার নিজের জন্যে আর ভাবিনে চৌধুরী, এ পারেও যেমন ও পারেও তেমনি, এতটুকু ভয় আমার নেই। আমায় বিচলিত করলে তোমার মেয়ে,—তোমার মিলা, নইলে এতক্ষণ তোমায় কেউ

জীবন্ত দেখতে পেতো না, তোমার মরাদেহ এতক্ষণ আমার সামনে লুটিয়ে পড়তো।—"

ভবেশ চৌধুরী বিহ্বলভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমি—"

গর্জ্জনের সুরে ধনপতি বলিলেন, "থামো—থামো, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাচ্ছিনে, তোমার অনেক সৌভাগ্যের ফলে এমন মেয়ে তুমি পেয়েছো। সে কথা যাক, আমি কিন্তু আমার পৈত্রিক ভিটেয় তোমার মত পাপিষ্ঠকে আর একদিনও থাকতে দেব না, তোমায় আজই চলে যেতে হবে আমার ভিটে ছেড়ে দিয়ে।"

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "আমি আজিই চলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি ধনপতি, তোমার সব জিনিষ তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেছি, তুমি ম্যানেজার অমূল্যের কাছে সে সব কাগজ পত্র পাবে। তোমার মেয়ে শুনলুম কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছে—"

"আমার মেয়ে—উর্ম্মি—"

ধনপতি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

ভবেশ চৌধুরী বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মেয়ে উর্ম্মি। অমূল্য তাকে তার বিষয়সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দেবে, আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই।"

ধনপতি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, বলিলেন, "উর্ম্মি এখানে এসেছে শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছি বই কি, সে কথা অস্বীকার করতে পারবো না। বেচারা—"

তিনি কি ভাবিলেন তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কেবল ওর জন্যেই আমি ভাবি, সুখী হওয়ার, সংসারী হওয়ার অধিকার নিয়ে এসেও সে কিছু পেলে না। আচ্ছা আমি চললুম—আজ এ বাড়ী

ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চাই, আমি উর্মিকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।"

বাহির হইবার পথে দেখা গেল মিলাকে, বারাণ্ডায় রেলিংয়ে ভর দিয়া সে উদাসনেত্রে সামনের বিস্তৃত আকাশের পানে তাকাইয়া আছে। পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া ধনপতিকে দেখিয়া সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিকট দিয়া যাইতে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া ধনপতি বলিলেন, "চৌধুরী এ যাত্রা বেঁচে গেল,—ভয় নেই, সে যেমন ছিল তেমনই বসে আছে দেখগে। প্রাণভয়ে যে অত ভীত—তাকে মারতে ধনপতি গাঙ্গুলী ঘৃণা বোধ করে—"

তিনি দ্রুত নামিয়া গেলেন।

মিলা ঘরের দিকে ফিরিল।

ভবেশ চৌধুরী স্থাণুরমত চেয়ারে আসীন—সামনে টেবলের উপর পড়িয়া আছে গুলিভরা রিভলভার—মিলা সেইটার পানে তাকাইল—রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল "বাবা—"

ভবেশ চৌধুরী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—অকস্মাৎ যেন জাগিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি মিল, ধনপতি আমায় হত্যা করেনি, সে রিভলভার ফেলে গেল—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল—"কিন্তু সে আমায় হত্যা করলেই ভালো হতো মিল, আমি মরে বাঁচতুম। এই অপমানের বোঝা মাথায় [illegible] মুখ দেখাব—কোথায় যাব—"

তিনি দুই[illegible] ঢাকিলেন।

তাঁহার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

মিলা বলিল, "কে বললে আপনাকে অপমানের বোঝা বয়ে এখানে থাকতে হবে বাবা ?—আমি আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে কেউ আপনার পরিচয় জানবে না—। এ সব কথা এখানে রাষ্ট্র হওয়ার আগেই আমরা বিদায় নিচ্ছি,—কেউ কিছু জানতে পারবে না। আপনি উঠুন, তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিন, দেড়টার ট্রেণেই আমরা চলে যাব।"

চলিতে গিয়ে ভবেশ চৌধুরী কাঁপিয়া পড়িয়া যান দেখিয়া মিলা তাহাকে ধরিল।—

৩৪

বিদায় - বিদায়—গ্রাম—

মিলা একবার পিছনে ফেলিয়া আসা গ্রামের পানে তাকাইল, তাহার দুইটী চোখ তখন জলে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে।

ভবেশ চৌধুরী দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া বেডিংটার উপর বসিয়া পড়িয়াছেন।

আর বন্ধু নাই, বান্ধব নাই ;—একদিন যাহারা তোষামোদ করিয়া চলিত আজ এই বিদায় মুহূর্ত্তে কেহ আসে নাই।

মিলা অমূল্যকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, অমূল্য খানিক আগে আসিয়াছিল, অতি গম্ভীর তাহার মুখ।—সে ভবেশ চৌধুরীর [illegible] জীবনের কথা জানিয়াছে।

মিলা বলিল, "আমরা আজ চলে যাচ্ছি এ ক[illegible] শুনেছেন তো, মিঃ

মিত্র ; জমীদারীর যিনি প্রকৃত মালিক তিনি এসেছেন, তাঁকে তাঁর কাগজপত্র গুলো দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।"

অমূল্য ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেবল কি এই কথা বলবার জন্মেই আমায় ডেকে পাঠিয়েছো মিলা—?"

মিলা বলিল, "প্রধান উদ্দেশ্য তাই বটে—"

অমূল্য বলিল, "ধনপতি গাঙ্গুলী কাছারী বাড়ীতে উঠেছেন, আর কাগজপত্রও সব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এ কথা শুনে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হবে। তোমরা চলে গেলে তিনি এ বাড়ীতে আসবেন, কাল সকালেই তাঁর প্রজাদের জানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া মিলা বলিল, "কিন্তু তিনি খুনি আসামী এখন নিজের নামে চলতে পারবেন ?"

অমূল্য বলিল, "সঙ্গে সঙ্গে সে অভিযোগও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রমাণ করা হয়েছে—তোমার বাবা বিষয় সম্পত্তি আর জুটমিলের জন্যে মিথ্যে তাঁর নামে এই অভিযোগ এনেছিলেন ; উর্ম্মির মাসিমা প্রমাণ দেবেন তাঁর বোন হার্টফেল করে মারা গেছেন। বাইশ বছরের পুরানো ঘটনাকে টাকার জোরে চাপা দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়। এখনি যা ঘটে গেল তাকেই যদি মিথ্যে বলে উড়ানো সম্ভব হয়—বাইশ বছর আগেকার ঘটনা অতি সহজে পারা যাবে।"

মিলাও প্রার্থনা করে তাই হোক।

[illegible] কর্তব্য সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

[illegible] দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল, [illegible] বলিয়াছে সে [illegible] সময় উপস্থিত হইবে।

মিলা বারবার পিছনের পানে চাহিতেছিল জয়ন্ত আসিবে বলিয়াছে —যদি সে আসে।

ট্রেণের ঘণ্টা দিয়াছে সিগন্যাল পড়িয়া গেছে। মিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ ফিরাইল—"উঠুন বাবা, ট্রেণ আসছে।"

ভবেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

সত্যই যাইতে হইবে,—সব যাক দুঃখ নাই, মিলার মাথায় এ কি বোঝা চাপাইলেন? পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে সন্তান? আঃ, ইহার চেয়ে যে মৃত্যু ভালো ছিল।

দূরে ট্রেণের ধুম দেখা যাইতেছিল।

পথের পানে তাকাইয়া মিলা বিস্ময়ে দেখিল জয়ন্তের মত কে ছুটিয়া আসিতেছে. হাতে একটা পুঁটলি ট্রেণ ষ্টেশানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেও আসিয়া পড়িল—

"এসেছেন ভশ্চায মশাই—?"

মিলা এই শেষ বিদায় মুহূর্ত্তে একজনকে বিদায় দিতে আসিতে দেখিয়া আনন্দ গোপন করিতে পারিল না।

জয়ন্ত ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "উঠুন উঠুন, আর কথা বলবেন না, ট্রেণ এখনি ছেড়ে যাবে। আগে ট্রেণে উঠে পড়ুন তারপরে কথা হবে—"

তাড়াতাড়ি করিয়া ভবেশ চৌধুরী ও মিলাকে টেণে উঠাইয়া দিয়া সে জিনিষপত্রগুলা তুলিয়া দিতে দিতে ঘণ্টা পড়িল।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিলা বলিল, "আর হয়তো আপনার [illegible] ভশ্চায মশাই, খানিক আগে এলে কথাবার্ত্তা হতে পা[illegible]

হাসিমুখে জয়ন্ত বলিল, "কি করব বলুন. [illegible] নিকেশ মিটিয়ে দিতে

দেরী হয়ে গেল, কিছুতেই সময় করে উঠতে পারলুম না। আচ্ছা, চলুন, কলকাতায় পৌঁছেই না হয় কথাবার্ত্তা হবে—"

ট্রেণ তখন চলিতে সুরু করিয়াছে, জয়ন্ত তাহার বোঁচকাটা লইয়া একলম্ফে পাশের কামরায় উঠিয়া পড়িল।

মিলা বুঝিল—তাহাদের সহিত জয়ন্তও গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

তাহার চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতে তখন ভিজিয়া উঠিয়াছে।

গোপালপুরের দেব মন্দিরে পূজারিণী ঊর্ম্মি। বেশীরভাগ সময় সে মন্দিরেই কাটাইয়া দেয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসরও কাটিয়া যায়, পূজারিণীর ধ্যান ভাঙ্গে না।

নূতন পূজারী পূজা করে, আরতি করে, কত দরিদ্র ভিখারী প্রসাদ পায়, ঊর্ম্মি নীরবে নিজের কাজ করিয়া যায়।

জীবনে তাহার কোন সাধ নাই, আশা নাই, কোন কাজে উৎসাহ নাই, তাহার সমস্ত জীবন সে ঢালিয়া দিয়াছে পাথরের ঠাকুরের উপর।

পিতা সম্পত্তি অধিকারের মাস দুই পরে মারা গিয়াছেন, জগতে মাসীমা ছাড়া ঊর্ম্মির কেহ নাই।

জয়ন্তের একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছিল—সেই পত্রখানা সে সর্ব্বদা নিজের কাছেই রাখে।

জয়ন্তের শেষ পত্র —সে জানাইয়াছে ঊর্ম্মিকে কিছুমাত্র না জানাইয়া চলিয়া আসার জন্য সে ক্ষমা চাহিতেছে। ভবেশ চৌধুরী তাহাকে কাজ দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেও বিদায় লইল। কলিকাতাতেই সে একটা কাজ পাইয়াছে, সেখানে থাকিবে।

[illegible] গিয়ে কোন একটা স্কুলে কাজ লইয়াছে, জয়ন্ত সেখানে প্রায়ই যাওয়া আসা করে।

উর্ম্মি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়া চমকাইয়া উঠে। হয়তো একদিন শুনিতে পাইবে জয়ন্তের সহিত মিলার বিবাহ হইয়াছে, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

উর্ম্মি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া দেবমূর্ত্তির পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে, আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে—"ঠাকুর ঠাকুর—"

নিঃশব্দে তাহার চোখ দিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া ঝরিয়া মেঝেটা প্লাবিত করিয়া তোলে।